৩৭ বর্ষ • ১ম সংখ্যা • জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জ্যোতিষ নিয়ে বিজ্ঞানীরা		৩
বাপ-ঠাকুরদার চাষ	পরিতোষ গিরি	৫
উইকিপিডিয়া ও বাঙালি	সুগত সিংহ	৭
শিশু ও খেলনা	অরুণালোক ভট্টাচার্য	৯
হঠাৎ মৃত্যু ঠেকানো যায়	গৌতম মিস্ত্রি	১১
মিশন ও নিবেদিতা	রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়	১৫
আকুপাংচার	ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০
পূর্ব কলকাতার জলাভূমি	ধ্রুবা দাশগুপ্ত	২৪
সিঙ্গুরের পর ভাঙড়	অরুণ পাল	২৮
পুস্তক পর্যালোচনা	তুষার প্রধান	৩১
সংগঠন সংবাদ		৩২

সম্পাদক
সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিসঃ বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪
কার্যালয়
খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস- ৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬
ফোনঃ ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৬৫
ওয়েবসাইটঃ www.utsamanush.com
ইমেলঃ utsamanush1980@gmail.com

আমাদের কথা

উপেনদের আবদার

এই জন্যই ওদের চাষা বলি। জমি জমি করেই মলো।সেই উপেনের কথা মনে আছে? 'সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,/ দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষীছাড়া!' যুক্তি দেখিয়ে জমিদারকে 'দুই বিঘা জমি' দিতে চায় নি। মার্কস নাকি এই কারণেই সমস্ত শ্রমিককে একজোট হতে আহ্বান জানালেও কৃষকদের ডাকেন নি। আরে জমি ধুয়ে কি জল খাবি! আমরা দেশটাকে আমেরিকা বানাব বলে পণ করেছি। পোশাকে-আশাকে, চলনে-বলেন, এমনকি জেন্ডারেও অনেকটা মার্কিনি হয়ে উঠেছি। পিছিয়ে আছি আকাশছোঁয়া বাড়ি, আর বিরাট চওড়া রাস্তায়, যা দিয়ে হুশহুশ করে গাড়ি ছুটবে। এসব না হলে উন্নয়ন হবে কী করে, আরও সভ্য হয়ে উঠব কীভাবে! এই চাষাগুলোর নোংরা, জলকাদামাখা মাটি এতই পছন্দ যে, সিঙ্গুরে গাড়ির কারখানা হতে দিল না। আমাদের স্বপ্ন ছিল পরিবারপিছু একটি সন্তান ও একটি গাড়ি। তা মাঠেই মারা গেল। শহরময় জিগজ্যাগ পাজলের মতো অসংখ্য লাল নীল হলুদ গাড়ি কিলবিল করে ঘুরছে, দেখলেই জুড়িয়ে যেত চোখ। হল না। নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব হল না। পরিবেশ দূষণ একটু হলে হত, তা নিয়ে অত চেঁচামেচির কী ছিল! সুপার স্পেশালিটি বেসরকারি হাসপাতালগুলো তৈরি করছি কী করতে! ভাঙড়ে আবদার বিদ্যুৎ সাব স্টেশন গড়তে দেবে না। থাম গাড়তে দেবে না। ওদের ঘরে হ্যারিকেন বা কুপি জ্বলে, রান্না হয় ঘুঁটে বা কাঠের জ্বালানিতে। না আছে টিভি, না ফ্রিজ বা এসি মেশিন। ওরা বিদ্যুতের মর্ম বুঝবে

পরের পাতায়

বইমেলায় উৎস মানুষ
স্টল নং ২৭৩

কী করে। বিদ্যুৎ ছাড়া আমাদের ঘরে টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, ইনডাকশান, মাইক্রোওয়েভ আভেন, এসি মেশিন, গিজার, ল্যাপটপ চলবে কী করে! সবচেয়ে বড় কথা মোবাইল ফোনে চার্জই বা দেব কীভাবে!

এখন চাষাগুলোকে কিলিয়েও শায়েস্তা করা যাচ্ছে না। অথচ কিছুদিন আগেও আমরা নিঃশব্দে হাজার হাজার বিঘে জলাজমি বুজিয়েছি, চাষাগুলোকে হাতে দু-চারটে টাকা গুঁজে, কখনও পিটিয়ে ঘরছাড়া করে জমি নিয়ে নিয়েছি। তা না হলে রাজারহাট, নিউ টাউন গড়ে উঠত কী করে! কেমন করে হত অমন বাইপাস! ওখানে গিয়ে দাঁড়ালেই চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয়ে এক খণ্ড আমেরিকা। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, এরকম আরো বানাব। দেখিয়ে দেব উন্নয়ন কাকে বলে। এসবের জন্য জমি লাগবে, বিদ্যুৎ লাগবে, সেটুকু তো দিতেই হবে। জানি, হাঘরে, হাভাতে চাষাগুলোকে মোটা টাকার লোভ দেখালেই ওরা জমি ছেড়ে দেবে। কিন্তু অত টাকা দিলে, আমরা, যারা দেশগড়ার মহান কাজে জমি সংগ্রহ করি, তারা ছেলেপুলে নিয়ে খাব কী! তাছাড়া আমাদের সযত্ন লালিত পেশিরই বা কী হবে! অব্যবহারে তাতে যে জং ধরে যাবে। কিলিয়ে একান্তই না হলে মস্তিষ্ক প্রক্ষালন জাতীয় কিছু ব্যবহার করা যায় কি না দেখতে হবে।

দিন কয়েক আগে এক কিশোর ফেসবুকে সবাইকে বিদায় জানিয়ে আত্মহত্যা করেছে। বাড়ি থেকে দোষারোপ করা হচ্ছে স্কুলকে। বোঝা যাচ্ছে, বাবা-মায়ের কোনো ভূমিকা নেই। তাঁরা নিরপরাধ! অথচ, একটা সময়, যখন বাবারা ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ, ডানপিটে ছেলেরা দোষ করে আশ্রয় নিত মা বা ঠাকুমার আঁচলের তলায়। ঘুড়ি, লাট্টু থেকে কাঠি লজেন্স কেনার পয়সা জোগাতেন মায়েরাই, আঁচলের গিঁট খুলে পয়সা দিয়ে। শ্রীমান পৃথ্বীরাজ-এর মতো বহু পুরনো বাংলা ছবিতে এখনও তার সাক্ষ্য রয়েছে। বিয়ের সময় ছেলের কেমন মেয়ে পছন্দ, তা সে বলত মায়ের কাছেই। মেয়েরা বাবার মুখের ওপর বলতে না পারলেও জানাত মাকে। এই তথ্যগুলো পেশ করা হচ্ছে পরিবারে মা-বাবার সঙ্গে ছেলেমেয়ের সম্পর্কের রসায়নটা বোঝাতে। অথচ আমরা আধুনিক, শিক্ষিত এবং প্রবল গতিময় হয়ে ওঠার পর বাবা-মায়েদের আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেশি ভাবার অবকাশ নেই। ওদের নামী স্কুলে ভর্তি করে, খান পাঁচ-ছয় প্রাইভেট টিউটরকে পিছনে লাগিয়ে দিয়ে, মোবাইল, ল্যাপটপ, মোটরবাইক, হাতখরচের দেদার টাকা দিয়েই পিতা-মাতার পবিত্র কর্তব্য সেরে ফেলছি। ওদের মনোজগতের হদিশ রাখার সময় কই! মাস কয় আগে একটি কিশোর বন্ধুদের পার্টিতে গিয়ে মদ্যপান করে এবং শেষে গোলমালে জড়িয়ে ভাঙা কাচের বোতলে প্রাণ দিল। তারপর চলল এ-ওর ঘাড়ে দোষ চাপানোর পালা। আমরা ভাবতে বসলাম না, এই অসুখের শিকড় কোথায়, কীভাবে মোকাবিলা করব। সত্যিই তো আমাদের হাতে অত সময় কোথায়!

উৎস মানুষ পত্রিকাকে যাঁর মানসপুত্র বলা যায়, সেই অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন ২০০৮ সালে। তাঁর বুকের মণিকে আগলে রাখার চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। সেই সঙ্গে পত্রিকা তথা বিজ্ঞান আন্দোলন ও সমাজে তাঁর অবদানের কথা জাগরূক রাখতে আয়োজন করা হচ্ছে স্মারক বক্তৃতার। এবার অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা অষ্টম বর্ষে। গত ২৬ নভেম্বর, জীবনানন্দ সভাঘরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ। পরিবেশ ও পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বাঁচানোর লড়াইয়ে উনি পুরোধা। ৩০-৩৫ বছর স্থানীয় মানুষদের নিয়ে জলাভূমি বাঁচানোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও। একেবারে বৈঠকি মেজাজে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন শ্রোতাদের সঙ্গে। অশোক শুধু পত্রিকা প্রকাশের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন না। সুন্দরবন থেকে কাঁচরাপাড়া, জাগুলিয়া বা হাতিবাগান– ঘুরে বেড়াতেন বিজ্ঞানকর্মীদের উৎসাহ দিতে। সেটা কীভাবে করতেন, তার প্রভাব কেমন পড়েছিল, তা জানাতে হাজির ছিলেন প্রবীণ সতীশ মণ্ডল। নদীয়ার বড়জাগুলির মানুষটির অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণেই অনুষ্ঠানের শুরু। তিনি জানান, সেই আশির দশকে উৎস মানুষ-কে ঘিরে রাজ্য জুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। যার প্রভাব পড়ে হরিণঘাটায়। সেখানে কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হয় নিরঞ্জন বিশ্বাসদের হাত ধরে। তারপর রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের দুটি গান শোনান গার্গী ঘোষ। চমৎকার নিবেদন। ধ্রুবা দাশগুপ্ত ধ্রুবজ্যোতিবাবুর সঙ্গে শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পরে উনি বলতে ওঠেন। বক্তৃতার শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বটিও হয়ে ওঠে মনোগ্রাহী।

জ্যোতিষ নিয়ে বিজ্ঞানীদের ঘোষণাপত্র

দ্য হিউম্যানিস্ট পত্রিকায় ৩৫, সংখ্যা ৫ (সেপ্টেম্বর/অক্টোবর ১৯৭৫) সংখ্যায় বিশ্বের প্রথম সারির ১৯২ জন বিজ্ঞানী একযোগে জানিয়ে দিয়েছিলেন জ্যোতিষ শাস্ত্রের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এটা কুসংস্কার বাড়ায়, প্রগতিরও অন্তরায় হয়ে ওঠে। সেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে স্যর ফ্রান্সিস ক্রিক বা লাইনাস পাউলিংয়ের মতো ১৯ জন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীও ছিলেন। ঘোষণাপত্রটি নিয়ে সেই সময় আলোড়ন পড়ে যায়। পরে বার্ট জে বক এবং লরেন্স ই জেরোম নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও বিজ্ঞান লেখক মিলে প্রকাশ করেন 'অবজেকশনস টু অ্যাস্ট্রোলজি' নামে একটি বই। প্রকাশক নিউ ইয়র্কের প্রমিথিউস বুক্স। সেই বইতে বিজ্ঞানীদের ঘোষণাপত্র এবং তাঁদের নামধাম দেওয়া আছে। এছাড়াও বইটিতে 'আ ক্রিটিক্যাল লুক অ্যাট অ্যাস্ট্রোলজি' এবং 'অ্যাস্ট্রোলজিঃ ম্যাজিক অর সায়েন্স?' নামে দুজনের লেখা দুটি প্রবন্ধও আছে। সেই আশির দশকেই অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এই বইটি এবং 'অ্যাথেইজম দ্য কেস এগেন্স গড', 'ফিলসফি অ্যান্ড অ্যাথেইজম' ও বিখ্যাত জেম্স র‍্যান্ডির 'ফ্লিম ফ্ল্যাম' নামে তিনটি বই প্রমিথিউস বুকস থেকে আনিয়েছিলাম। সময় অনেকটা এগিয়ে গেছে। কিন্তু জ্যোতিষ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস একটুও টলে নি। উল্টে দিন দিন বেড়ে চলেছে। সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরও নানা কুসংস্কার। টিভিতে বড় গলা করে 'ধনলক্ষী' কিনলে কীভাবে ভাগ্য ফিরে যাবে তার প্রচার করছেন কিছু লোক। টিভির দর্শক সাগ্রহ তা গিলছেন এবং সেগুলো কিনে ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টা করছেন। তাই প্রাসঙ্গিক মনে করে বক ও জেরোমের বই থেকে বিজ্ঞানীদের সেই প্রতিবাদপত্রটি তুলে দিলাম। বইতে ১৯২ জন বিজ্ঞানীরই নাম আছে। সেই তালিকা থেকে ১৯ জন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীর নামই উল্লেখ করা হল।

অনুবাদঃ সমীরকুমার ঘোষ

১৯২ জন বিজ্ঞানীর ঘোষণাপত্র

বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে, তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করা বিজ্ঞানীদের নজরে এসেছে। জ্যোতিষীরা ব্যক্তিগতভাবে ও প্রকাশ্যে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন ও নিদান দেন, আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী জ্যোতির্বিদ, জ্যোতির্পদার্থবিদ এবং অন্য ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীরা, সাধারণ মানুষকে সেগুলোকে প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সাবধান করতে চাই। যাঁরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখতে চান তাঁদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

প্রাচীনকালে মানুষ জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী ও উপদেশে বিশ্বাস করত, কারণ, জ্যোতিষশাস্ত্র তখন তাদের জাদুকরী জগৎ বীক্ষারই অংশবিশেষ ছিল। তারা আকাশের গ্রহনক্ষত্রগুলোকে ঈশ্বরের বাসস্থান বা শুভ-অশুভ ঘটনার পূর্বলক্ষণ বলে ভাবত আর তাই সেগুলোকে জাগতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করে ফেলত। পৃথিবী থেকে ওই সব গ্রহনক্ষত্রগুলো কত দূরে সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। এখন সেগুলো কত দূরে তা জানা হয়ে গিয়েছে বা হিসেব করে বার করে ফেলা যায়। দূরবর্তী গ্রহ এবং আরো বহু দূরে থাকা নক্ষত্রদের মহাকর্ষ বল এবং অন্যান্য প্রভাব কত নগণ্য, তাও আমরা জেনে গিয়েছি। তাই জন্মানোর সময় ওই গ্রহ-তারারা যে শক্তি প্রয়োগ করে, তার প্রভাব আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেবে, এটা কল্পনা করা নিছক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। সুদূর মহাকাশে থাকা গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের কারণে নির্দিষ্ট কিছু দিনক্ষণ ও সময়কাল কিছু বিশেষ ধরনের কাজ করার ক্ষেত্রে আরও বেশি অনুকূল হয়ে উঠবে, এই ধারণাটা যেমন সত্যি নয়, তেমনই এটাও সত্যি নয়, যে যে রাশির অধীনে জন্মেছে, সেই রাশিই নির্ধারণ করে দেবে সে আর পাঁচজনের থেকে কতটা যোগ্য বা অযোগ্য হবে।

লোকেরা জ্যোতিষে বিশ্বাস করে কেন? বর্তমান অনিশ্চিত সময়ে অনেকেই কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় অন্যের পরামর্শ নিতে চায়। তারা বিশ্বাস করতে চায়, তাদের ভবিষ্যৎ মহাজাগতিক শক্তি দ্বারা পূর্বনির্ধারিত, যা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যদিও আমাদের সবাইকেই বাস্তবের মুখোমুখি হতেই হবে এবং এটাও অনুধাবন করতে হবে যে, আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের ওপরেই নির্ভর করছে, গ্রহতারাদের ওপর নয়।

যে কেউ এটা ভাবতেই পারেন, জ্ঞান ও শিক্ষার ব্যাপকতর প্রসারের এই যুগে যে বিশ্বাস জাদু ও অতিপ্রাকৃত নির্ভর, তার মোহ থেকে কাউকে মুক্ত

করার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই। তবুও জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা আধুনিক সমাজকে ছেয়ে ফেলছে। বাছবিছার না করেই লাগাতারভাবে প্রচারমাধ্যম তথা নামী সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা এবং পুস্তক প্রকাশনার মাধ্যমে যেভাবে জ্যোতিষের ছক, ভবিষ্যদ্বাণী ও ঠিকুজিকুষ্ঠী ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাতে আমরা বিশেষভাবে বিচলিত। এগুলো কেবলমাত্র যুক্তিহীনতার বাড়বাড়ন্ত ঘটাবে এবং প্রগতিবিরোধিতা গড়ে তুলতেই সাহায্য করবে। আমরা বিশ্বাস করি, জ্যোতিষের প্রবক্তাদের ভাঁওতাপূর্ণ দাবির বিরুদ্ধে এবার সরাসরি এবং জোরদারভাবে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার সময় এসেছে।

যাঁরা জ্যোতিষে বিশ্বাস রেখে চলবেন, তাঁরা তা করতেই পারেন, যদিও এটা স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান, তাঁদের বিশ্বাসের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, উল্টে তার বিপক্ষেই জোরালো প্রমাণ রয়েছে।

(নিচে স্বাক্ষর)

- বার্ট যে বক, এমেরিটাস প্রফেসর, অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়
- লরেন্স ই জেরোম, বিজ্ঞান লেখক, সান্তা ক্লারা, ক্যালিফোর্নিয়া
- পল কুরৎজ, প্রফেসর অভ ফিলসফি, সানি, বাফালো

স্বাক্ষরকারীরা

নোবেল পুরস্কার প্রাপক

হ্যান্স এ বেথে, প্রফেসর এমেরিটাস অভ ফিজিক্স, কর্নেল

স্যর ফ্রান্সিস ক্রিক, মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল, কেমব্রিজ, ইংল্যান্ড

স্যর জন একলেস, ডিস্টিংগুইশ্‌ড প্রফেসর অভ ফিজিওলজি অ্যান্ড বায়োফিজিক্স, এসইউএনওয়াই, বাফালো

গেরহার্ড হেরৎসবার্গ, ডিস্টিংগুইশ্‌ড রিসার্চ সায়েন্টিস্ট, ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল অভ কানাডা

ওয়াসিলি লিয়েনটিয়েফ, প্রফেসর অভ ইকনমিক্স, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি

কনরাড লরেঞ্জ, ইউনিভ প্রফেসর, অস্ট্রিয়ান অ্যাকাডেমি অভ সায়েন্সেস

আঁদ্রে এম লওফ, অনারারি প্রফেসর, ইনস্টিটিউট পাস্তুর, প্যারিস

স্যর পিটার মেডাওয়ার, মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল, মিডলসেক্স, ইংল্যান্ড

জ্যাক মঁদ, ইনস্টিটিউট পাস্তুর, প্যারিস

রবার্ট এস মুলিকেন, ডিস্টিংগুইশ্‌ড প্রফেসর অভ কেমিস্ট্রি, ইউনিভার্সিটি অভ শিকাগো

লাইনাস সি পাউলিং, প্রফেসর অভ কেমিস্ট্রি, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি

এডওয়ার্ড এম পারসেল, গেরহার্ড গাডে ইউনিভার্সিটি প্রফেসর, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি

পল ও স্যামুয়েলসন, প্রফেসর অভ ইকনমিক্স, এমআইটি

জুলিয়্যান শুইংগার, প্রফেসর অভ ফিজিক্স, ইউনিভার্সিটি অভ ক্যালিফোর্নিয়া, লস এঞ্জেলেস

গ্লেন টি সিবর্গ, ইউনিভার্সিটি প্রফেসর, ইউনিভার্সিটি অভ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কেলে

জে টিনবারগেন, প্রফেসর এমেরিটাস, রটারডাম, দ্য নেদারল্যান্ডস

এন টিনবারগেন, এমেরিটাস প্রফেসর অভ অ্যানিম্যাল বিহেভিয়ার, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি

হ্যারল্ড সি উরে, প্রফেসর এমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অভ ক্যালিফোর্নিয়া, সান ডিয়েগো

জর্জ ওয়াল্ড, প্রফেসর অভ বায়োলজি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থানঃ পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন **নম্বরঃ** ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

বাপ ঠাকুরদাদার চাষ

পরিতোষ গিরি

জঙ্গল হাসিল করা সুন্দরবনে বাঁধবন্দী নোনা এলাকা তখন প্রায় এক ফসলী অঞ্চল। আমন চাষ এই অঞ্চলের প্রধান চাষ বললেই চলে। দেখা যায়, এই অঞ্চলের আর পাঁচটা উৎসবের মতো আমন চাষকেও এলাকাবাসী একটি উৎসব হিসেবে ভাবে। তাই সবাই এই চাষটি সপরিবার মনোযোগ সহকারে করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন চাষীদের মুখের একটি প্রবাদ হল— 'কর চাষ, মরুক বলদ, হোক ধান, বছর বছর বলদ কিনে আন।' চাষ শুরু হয় অম্বুবাচী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, শেষ হয় মনসাপূজা দিয়ে। নতুন ধান ঘরে এলে (ভাদু) লক্ষীপূজা ও নবান্নের অনুষ্ঠান হয়। আমার মনে হয় এত পূজার অনুষ্ঠানের কারণ চাষ নষ্ট হওয়ার ভয়। আর ভয় থেকে দেবতা ভক্তির উৎপত্তি।

'১৬ চাষে মূলা, ৮ চাষে পান ও ৩ চাষে ধান'— এই প্রথা অনুসারে তিন চাষে আমন ধান চাষ করা হত। আমি সুন্দরবন এলাকার প্রবীণ চাষী মহোদয়ের কাছ থেকে শুনেছি, জ্যৈষ্ঠ/আষাঢ় মাসে প্রথম বৃষ্টি হলে সেই জল স্লুইস গেট দিয়ে নদীতে বের করে দেওয়া হত। *কাড়ানের জলও নদীতে বের করে দেওয়া হত। পচানি ও কাদাচাষে জল ক্ষেতে জমিয়ে রাখা হত। ওঁদের প্রশ্ন করে কারণ জানা যায় যে, জ্যৈষ্ঠ/আষাঢ় মাসে ভূমির উপরিভাগে লবণ থাকে, তাই প্রথম ধুয়ান বের করে দিলে মাটির লবণাক্ত ভাব কমে। কাড়ানের পর জল নদীতে বের করে দিলে মাটির ভিতরের লবণাক্ত ভাব কমে ও আলো বাতাস মাটিতে প্রবেশ করে তাই ধুয়ান বের করে দেওয়া হয়। পচানিতে ক্ষেতে জল জমিয়ে রাখা হয়। তার কারণ আষাঢ়ের বর্ষার জল ক্ষেতের মাটি, ঘাসপাতা ও ছড়ানো খোল-গোবর দ্রুত পচিয়ে জৈব সারে পরিণত করে জমিকে ধান রোপণযোগ্য করে তোলে এবং বৃষ্টির জল মাটির লবণাক্ত ভাব কমায়। কাদাচাষের সময় ক্ষেতে জল জমিয়ে রাখলে চষা মাটির মধ্যে মিঠাজল প্রবেশ করে। সেই কারণে আচষা মাটির মধ্যেকার লবণজলকে, বৃষ্টির মিঠা জল না শুকানো পর্যন্ত বেশিটাই আবদ্ধ রাখে। যেহেতু অতীতে কোনো চাষীর জমির আল (বাঁধ) থাকত না তাই সবাই একই সঙ্গে চাষ করতেন। তখনকার দিনে প্রগতিশীল চাষীরাই ছিলেন তথাকথিত চাষীদের শিক্ষাগুরু। তাঁদের শিক্ষাঙ্গন ছিল চণ্ডীমণ্ডপ, সেখানেই চাষের কথা সব চাষীদের মধ্যে অকপটে বিনিময় হত। ভারতবর্ষ তখন খাদ্যসঙ্কটে ভুগছে, তাই সবাই সবার সমব্যথী চাষী ছিলেন। সেই কারণে আমার মনে হয়, আজও গ্রামবাংলায় সবার মুখে মুখে এই প্রবাদটি শোনা যায়, 'পাশাপাশি বাস, দেখাদেখি চাষ।' কোথাও 'লাগালাগি বাস' কথাটাও শোনা যায়।

আমনচাষের প্রথা অনুসারে জ্যৈষ্ঠ/আষাঢ় মাসের প্রথম বৃষ্টিতে কাঁকড়ি বীজতলা তৈরি করা হয়ে থাকে। আষাঢ়/শ্রাবণ মাসের মধ্যে জমি চষে মই দিয়ে কাদা তৈরির কাজ শেষ করা হত। আমন ধানের জাত অনুযায়ী প্রতিটি গোছে (গুছি) ৩ থেকে ৬টা পর্যন্ত পাতা (চারা) দিয়ে ৯ ইঞ্চি থেকে ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত দূরত্বে ভাদ্র মাসের মধ্যে রোয়া (রোপণ) শেষ করা হত। লাঙ্গল দেওয়া থেকে শুরু করে রোপণ কাজ সারা পর্যন্ত প্রায় তিন মাস সময় লাগত, ফলে চাষার হাত-পা দুর্গন্ধ হয়ে যেত। কথিত আছে চাষার হাত-পায়ে দুর্গন্ধ হত বলে চড়াই পাখি নাকি এই সময় চাষার ঘরে থাকত না। রোপণের প্রায় এক মাসের মধ্যে খয়ালি (নিড়ানি) করে ঘাস মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হত। ধানগাছে পোকা লাগলে নানারকম তেতো গাছের ডাল পুঁতে দেওয়া হত। ইঁদুর যাতে নষ্ট না করতে পারে তার জন্য কলার ডাঁটা মাঠের মধ্যে শুইয়ে দেওয়া হত। কাঠ দিয়ে মাচা বেঁধে রাখা হত যাতে রাত্রে পেঁচা বসবে এবং ইঁদুর ধরবে। মোট ৫-৬ মাস মেয়াদের ধান, তাই অগ্রহায়ণ/পৌষ মাসে জমির জল সরিয়ে ধান কেটে বাড়ি আনা হত।

বিঘাপ্রতি বীজতলার জন্য প্রায় ৬-৭ কেজি বীজধান লাগত। জমিতে লাঙ্গল/মই দেওয়ার জন্য প্রায় তিনটি কাজের দিন লাগত। পাতা তুলে রোয়া কাজ করতে প্রায় ৪টি কাজের

* সুন্দরবন এলাকায় লাঙ্গল, বলদ দিয়ে চাষ পদ্ধতির তিনটি পর্যায় ছিল ১. কাড়ান, ২. পচানি ও ৩. কাদা।

দিন লাগত। ধান ঝাড়িয়ে গোলাজাত পর্যন্ত প্রায় তিনটি কাজের দিন লাগত। প্রতি বিঘায় প্রতি জনের।

সে সময় সুন্দরবনে যে সমস্ত চাষ-উপযোগী স্থানীয় ধান চাষ হত – দুধেশ্বর, পাটনাই, রূপসাল, মরিসসাল, রামসাল, দাঁতসাল, বিডিওমোটা, জুব্বারমোটা, নোনাবখড়া, জলাকামিনী, খেঁজুরছড়ি, মালাপতি, হরকুল, সরুগেঁতি, গোলগেঁতি, কনকচূড়, ঘেঁউস, হামাই, শুঙ্গহামাই ইত্যাদি।

ধানচাষের মতো সবজিচাষেও নোনাকে এড়ানোর চেষ্টা করা হত। যদিও সবজিচাষ ব্যাপকভাবে হত না। যেহেতু সুন্দরবনে জলাজমির পরিমাণ ছিল বেশি। অনেক দূরে দূরে হাট বসত। যাতায়াত ব্যবস্থা তত ভাল ছিল না। তাই নিজেদের সংগ্রহের নোনা সহনশীল বীজ দিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মতো সবজি উৎপাদন করা হত।

তখনকার দিনের চাষপদ্ধতি ছিল – চৈত্র/বৈশাখ মাসে ক্ষেতের মাটি ফেটে গেলে বড় বড় চাং তুলে উলটে এক-দু মাস ধরে রোদে ভাল করে শুকোতে হত। এরপর চাষীরা বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকতেন। এক পশলা বৃষ্টি হলে, বাড়িতে থাকা পুরাতন জৈব সার বাগানে ছড়িয়ে সুন্দর করে কুপিয়ে মাটি তুলে জো বেঁধে দিত। কোপাতে দেরি করলে চাং তোলা মাটি শক্ত হয়ে যেত, আর ভেঙে ফসলচাষ করা যেত না। তাই হয়ত প্রবীণ চাষীভাইরা বলতেন, 'চলে গেলে এক জো, কী করবে সাত পো।"

চাষীভাইরা চাষ করতেন নোনা সহনশীল– লাউ, কুমড়ো, শসা, ঝিঙ্গে, তুরুল, উচ্ছে, বরবটি, শিম, ডাঁটাশাক, পুঁইশাক, ঢ্যাঁড়স, বেগুন, কলা, পেঁপে, ওল, কচু, আদা, হলুদ, লালশাক, পালংশাক, মূলা, কফি, বিট, গাজর, টমেটো, তরমুজ, লঙ্কা ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যেত যে, বর্ষার সময় ভাটির মাথায় ফসল লাগত আর অন্য সময় ভাটির নিচে বসাত। আমার মনে হত যে, বাপ-ঠাকুরদাদারা কেন এই পদ্ধতিতে চাষ করে? কারণটা কি বর্ষায় জল জমে যাবে বলে বর্ষায় ভাটির মাথায়, আর অন্য সময় জল দিতে হবে বলে ভাটির নিচে? না, এছাড়া অন্য আর কেনো কারণ আছে ভাবতে ভাবতে এক দিন আমি নামখানার একটি নদীর চরে ম্যানগ্রোভ বসানো যাবে কিনা দেখতে যাই। মাসটা ছিল চৈত্র। চর দেখে নদীর বাঁধের ওপর দিয়ে ফিরছি, এমন সময় দেখি এক দিদিমা নারকেলের মালা (খোলা) দিয়ে নোনা ধুলো চেঁছে হাঁড়ির মধ্যে ঢোকাচ্ছে। আমি আস্তে আস্তে ওঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এই কুশ মাটি দিয়ে কী করবেন? উনি বললেন, নুন তৈরি করব বাবা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে? তখন উনি আমাকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে লবণ তৈরির সব পদ্ধতি দেখালেন। দেখলাম যে একটি ২ হাত লম্বা, ২ হাত চওড়া ও ১ হাত গভীর গর্তে নোনা ধুলোগুলো নদীর জলে ভিজিয়ে তিন ভাগ ভর্তি করে বাকি অংশ নদীর নোনা জল দিয়ে ভর্তি করে দেয় এবং নীচে একটি ছোট গর্ত আছে যেখানে সারা রাত ধরে চুঁইয়ে আসা পাড় লবণ জলে ভর্তি হয়। সকালে ঐ জল ফুটিয়ে লবণ তৈরি করা হয়।

এই ঘটনা দেখার পর আমার মনে প্রশ্ন এল, ঐ নদীর বাঁধের মাটিতে লবণ কোথা থেকে এল? আমি আবার ফিরে নোনা ধুলো সংগ্রহ করার স্থানে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, যে জায়গাটি ঢালু ও তিনটি ধাপে আছে, প্রথম ধাপ ধানজমি, দ্বিতীয় ধাপ বাঁধের বকচর, তৃতীয় ধাপ নদীর বাঁধ। ধানজমি থেকে বকচর হাত দুই উঁচু। বাঁধের মাথা প্রায় ১০-১২ হাত উঁচু ও সবটাই ঢালু। আরও দেখলাম, ধান মাঠে নোনা নোনা ভাব, বকচরে নোনা ধুলো আছে, কিন্তু বাঁধের ঢালে অনেক বেশি নোনা ধুলো আছে। এখানে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলাম, বাঁধের ঢালে লবণযুক্ত ধুলো বেশি কেন? দূরে ফাঁকা মাঠের দিকে তাকালে চৈত্রের দুপুরের রোদে মাটির জল বাষ্পের একটা অনুভূতি অনুভব করা যাচ্ছিল। এ থেকে আমি অনুভব করতে পারছিলাম যে, মাটির লবণ মিশ্রিত জল ভূমির সর্ব উচ্চস্থানে বেশি পরিমাণে বাষ্প হয় এবং বাষ্প হওয়ার সময় লবণকে মাটির উপরিভাবে রেখে জল উবে যায়।

আমার মনে হয়, এই কারণেই বুঝি বাপ-ঠাকুরদারা সুন্দরবন অঞ্চলে ভাটি তোলা পদ্ধতিতে ফসল চাষবাস করত। গরমের সময় ভাটির নীচে ফসল লাগাত। তখন হয়ত ভাটির মাথা লবণাক্ত হত। আর বর্ষার সময় ভাটির মাথায় ফসল লাগাত। সম্ভবত তখন লবণ ধুয়ে ভাটির নিচে যেত। আজও সুন্দরবন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ালে, নোনা অধ্যুষিত এলাকা সমূহে অনেক প্রবীণ চাষীভাইদের মধ্যে এই চাষপদ্ধতি দেখা যায়।

অনিবার্য কারণে ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতাটি এবারের সংখ্যায় দেওয়া গেল না। সেটি আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।

উমা

উইকিপিডিয়া ও বাঙালির বৌদ্ধিক ডিগবাজি

সুগত সিংহ

উইকি আসলে একটি সফ্‌টঅয়্যার। উদ্ভাবক ওয়ার্ড ক্যানিংহ্যাম নামে এক মার্কিন প্রোগ্রামার। হাওয়াই দ্বীপে হনিমুনে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন, উইকিবাস উইকিট্যাক্সি ছুটে বেড়াচ্ছে। উইকি মানে সঙ্গে সঙ্গে, ঝটপট, ধাঁই কিরি কিরি। উইকির উপর ভিত্তি করে যে সাইটগুলি চলে সেখানে ঢুকে মূল বিষয়ে যে কেউ লিখতে পারেন, যে কেউ তা কাটছাঁট করতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা লেখার মধ্যে চলে আসে। উইকি মূলত অনামা। চাইলে নামধাম, মেল আইডি, রেজিস্ট্রেশন করা যায়।

যাঁরা নিয়ত ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, তাঁরা উইকিপিডিয়ার সঙ্গে পরিচিত। সাইটটির উপর লেখা থাকে, 'The free encyclopaedia that anyone can edit'। এতদিন এনসাইক্লোপিডিয়া লেখার জন্য বিশেষজ্ঞ ভাড়া করে আনা হত। উইকিপিডিয়া সেই ধারা ভেঙে দেয়। এখানে যে কেউ লিখতে পারেন। ধরা যাক, এক বিশেষজ্ঞ লাঙল নিয়ে একটি পেজ লিখলেন। এবার কোনো কৃষকের মনে হল, আগের জন অ্যাকাডেমিক, ঠাণ্ডা ঘরে বসে যা লিখেছেন তাতে কিছু খামতি আছে। হাতেনাতে লাঙল চালানোর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি তাতে কিছু যোগ বা বাদ দিতে চান। তিনি তা করতে পারেন। কোনো অনুমতি বা যাচাই (ক্রস চেকিং) ছাড়াই সঙ্গে সঙ্গে তা উইকিপিডিয়ায় প্রতিফলিত হবে। মজাটা হচ্ছে, কেউ যদি উইকিপিডিয়ায় ঢুকে লাঙল ধরে সার্চ দেন, তা হলে সাম্প্রতিক পেজটাই খুলবে। কিন্তু আগে যদি একশোবার সংশোধন হয়ে থাকে তো চাইলে একশোটি পেজ আপনি দেখতে পাবেন।

উইকিপিডিয়ায় তুষার রায়কে নিয়ে কোনো পেজ না থাকলে দায় আমাদের। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কোনও ভুল তথ্য থাকলেও দায় আমাদের। উইকিপিডিয়া আমাদের শুধু পড়তে ডাকে নি, সে চাইছে আমাদের কাছে যদি কোনও তথ্য থাকে তো আমরা পাতাগুলো তৈরি করি বা সম্পাদনা করি। এই ক্রাউড সোর্সিং-এর ফলে উইকিপিডিয়ার সাফল্য তুঙ্গে উঠেছে। ২৯৪টি ভাষায় ৪ কোটির বেশি লেখা নিয়ে ইউকিপিডিয়া এখন প্রথম দশটি জনপ্রিয় সাইটের অন্যতম। ব্রিটানিকা অনলাইন চলে গেছে ৫ হাজারের নিচে। ২০০৫ সালে ব্রিটেনের নামজাদা বিজ্ঞান পত্রিকা 'নেচার' উইকিপিডিয়া এবং ব্রিটানিকা নিয়ে একটি সমীক্ষা চালায়।[১] দেখা যায়, ছোটখাটো তথ্যের ভ্রান্তি এবং অনুল্লেখের শতকরা হিসেবে দুটি একই জায়গায় রয়েছে। উইকিপিডিয়া সঙ্গে সঙ্গে ভুলগুলো ঠিক করে নেয়। কিন্তু আরেকটা সংস্করণ ছাপা না হওয়া অবধি ব্রিটানিকায় তা করার উপায় ছিল না। কিন্তু তারা উচ্চঘর, কংসরাজের বংশধর। তাদের অ্যাদ্দিনের আভিজাত্য ও অহমিকায় প্রচণ্ড ঘা লাগে এবং তারা নেচার পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা করার ভয় দেখাতে থাকে। তার আগেই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো উইকিপিডিয়া এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে আরও ৭৯টি ভুল বার করে এবং সেগুলোর সংশোধিত চেহারা কী হতে পারে তা উইকিপিডিয়ায় তুলে ধরে। প্রতিদিন জ্ঞানের বহর যে হারে বাড়ছে, তাতে যে কোনও ছাপা বই, প্রকাশের দিন থেকেই ফসিল হতে শুরু করে। উইকিপিডিয়া সেখানে জীবন্ত প্রাণীর মতো প্রতিদিন বেড়ে বেড়ে ওঠে। উইকিপিডিয়ার চাপে ২০১২-তে ব্রিটানিকা তাদের ২৪৪ বছরের ছাপা সংস্করণ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। মাইক্রোস্‌ফটের এনকার্টাও উইকিপিডিয়ার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে নি। কারণ, ও দুটোর তথ্য দেখতে গেলে পয়সা লাগে। উইকিপিডিয়া বিনি পয়সায় দেখা যায়, বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা যায়।

উইকিপিডিয়ার মূল সমস্যা হচ্ছে নিউট্রালিটি বজায় রাখা। পোল্যান্ডে একটি শহর আছে যাকে জার্মানরা Danzig বলে। পোলিশরা বলে Gdansk। অধিবাসীরা মূলত জার্মান। তারপর পোলিশ। এই Polish Corridor নিয়ে নাৎসিদের আবেগের শেষ ছিল না এবং হিটলার তা দখল করে নিয়েছিলেন। উইকিপিডিয়াতে Danzig লেখা হবে, না Gdansk, এই নিয়ে জার্মান এবং পোলিশ উইকিপিডিয়ানদের মধ্যে এডিট ওয়ার বেধে যায়। আসলে সেন্টিমেন্টটা জার্মান এবং পোলিশ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। বাংলাকে যদি কোনও আন্তর্জাতিক মঞ্চে বংগাল লেখা হয় আমাদেরও নিশ্চয়ই আঁতে ঘা লাগবে। এই এথনিক সাইবার যুদ্ধ দু বছর ধরে চলে। দীর্ঘদিন লিখতে লিখতে কিছু উইকিপিডিয়ান

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং আরবিট্রেটর পদে উন্নীত হন। এঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় শেষমেশ সাব্যস্ত হয়, ইতিহাসের যে যে পর্যায় শহরটি জার্মান অধিকারে ছিল সেখানে Danzig (Gdansk) লেখা হবে আর যে যে পর্যায়ে পোলিশ অধিকারে ছিল সেখানে Gdansk (Danzig) লেখা হবে। ওই শহর থেকে উঠে আসা কোনও বিখ্যাত ব্যক্তি যদি জার্মান হন তো তাঁর এন্ট্রিতে Danzig (Gdansk) এবং পোলিশ হলে উল্টোটা লেখা হবে। উইকিপিডিয়ানরা জোরাজুরি বা ভোটাভুটির বদলে আলোচনায় বিশ্বাসী।

তাইওয়ান, হংকং এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা চীনারা সাবেকি হরফে লেখেন। ওই এক হরফকে কমিউনিস্ট চীন স্বাক্ষরতা বাড়ানোর জন্য সহজ করে নিয়েছে। মানে ভাষাটা এক, হরফ দু রকম। চৈনিক উইকিপিডিয়া ওই দুই হরফের ঠোকাঠুকিতে একটা ছন্নছাড়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেল। শেষে ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পিএইচডি ছাত্র ঝেংঝু ছদ্মনামে উইকি সফ্‌টঅয়্যারে একটা ফিচার জুড়ে দিলেন। চৈনিক উইকিপিডিয়ায় একটা বাটন চলে এল, যেটা ক্লিক করলে একই আর্টিকেল সাবেকি এবং সরল হরফে পালটে যায়। এরকম নানা সমস্যা থেকে প্রোগ্রামাররা স্বেচ্ছায়, বিনা পারিশ্রমিকে উইকিপিডিয়াকে বিভিন্ন সময়ে বাঁচিয়েছেন।

আরেকটি সমস্যা হল নানা ধরনের ভ্যানডালিজম। কোম্পানিগুলো তাদের প্রোডাক্টের উপর পেজ তৈরি করে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে। কেউ কেউ দুষ্টুমি করে ১৯৮৯-কে ১৯৯০ করে দেয়। কেউ বা Gay Niggers Association of America নামে একটি আপত্তিকর আর্টিকেল তৈরি করে। খোঁজ নিয়ে দেখা যায় ওরকম কোনও সংস্থা আমেরিকায় নেই। পেজটা ডিলিট করে দেওয়া হয়। এই চিরতরে পেজ ডিলিশনের ক্ষমতা একমাত্র অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের আছে। এক স্কুলের ছাত্র তার অপছন্দের দিদিমনির উপর ঠেস দিয়ে একটি আর্টিকেল তৈরি করে। সেই স্কুলের আইপি অ্যাড্রেস ব্লক করা হয়। কিন্তু একজনের দোষে পুরো স্কুলকে ব্লক করা যায় না। অন্যরা তো উইকিপিডিয়াকে সমৃদ্ধও করতে পারে। এক হপ্তা বাদে তা তুলে নেওয়া হয়।

কিন্তু কেউ যখন বদমাইশি করে USA Today-র সম্মানিত সাংবাদিক জন সেইগেনথলারের বায়োগ্রাফিতে লিখে দেয় তিনি কেনেডির হত্যায় জড়িত ছিলেন তখন ঘটনাটা সিরিয়াস হয়ে যায়। এই ন্যাক্কারজনক ভুয়ো তথ্যটি উইকিপিডিয়ায় ১৩২ দিন জ্বলজ্বল করেছে। তারপর জন সাহেব প্রতিবাদ জানানোয় ধরা পড়ে। সেদিন উইকিপিডিয়ানদের মাথা হেঁট হয়ে গেছিল। তারপর থেকে সেনসিটিভ আর্টিকেলগুলি এডিট ব্লক করা হয়। সেগুলিতে যোগবিয়োগ করতে হলে আগে অ্যাডমিস্ট্রেটরদের জানাতে হয়। জীবিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সোর্স দেওয়া না থাকলে সদর্থক, কদর্থক বা সন্দেহজনক কোনও তথ্য সঙ্গে সঙ্গে বাদ দেওয়া হয় যেখানে সেকেন্ডে তিনটি করে এডিট হয় সেখানে এই নজরদারি চালানো দুরূহ। Recent Changes বলে একটি অপশন আছে যেটা ক্লিক করলেই গত কয়েকদিনে কী পরিবর্তন হয়েছে তা এক জায়গায় চলে আসে। বিশাল সংখ্যক ভলান্টিয়ার্স শুধু সেটার উপর নজর রাখেন।

২০০৫ সালের ৭ জুলাই লন্ডন টিউব বম্বিং-এর ঠিক চার মিনিটের মাথায় উইকিপিডিয়ায় পেজ চলে আসে। মাত্র পাঁচ লাইনের এন্ট্রিতে জানানো হয়েছিল বৈদ্যুতিক গোলযোগে কোন কোন স্টেশনে বিস্ফোরণ হয়েছিল। খবরটা ভুল ছিল। আস্তে আস্তে টেররিস্ট অ্যাটাকের সঠিক খবর বেরোতে থাকে এবং পরের চার ঘণ্টায় হাজারটা কারেকশন হয়। শুধু খবর নয়, কোন নম্বরে ফোন করলে হেল্প পাওয়া যাবে বা স্টেশনগুলোতে আটকে পড়া যাত্রীরা কোন রাস্তা দিয়ে বেরোতে পারবেন তাও জানানো হতে থাকে। ঘটনাস্থল থেকে ভুক্তভোগী মানুষরাই মোবাইলে এই এন্ট্রিগুলো করেছিলেন। উইকিপিডিয়ার এই জীবনদায়ী ভূমিকা সেদিন মানুষের মনে গেঁথে যায়।

আবার এখানেও নন্দীগ্রামে গুলি চলার কয়েকদিনের মধ্যে উইকিপিডিয়ায় পেজ চলে আসে। আজ অব্দি সেই পেজে পাঁচশোর উপর সংশোধন দেখেছি। প্রথমত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ওই ঘটনার নানা ব্যাখ্যা আছে। সেগুলি সময়ে সময়ে ঢুকেছে। সুতরাং ওই সংশোধনীগুলোর তুলনামূলক বিচার করলে নিদারুণ এক রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ছবি বেরিয়ে আসে যেটা সমাজতাত্ত্বিক বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের হাতে গবেষণার নতুন অস্ত্র তুলে দিতে পারে। দ্বিতীয়ত নন্দীগ্রামে যখনই হিংসা বেড়ে উঠেছে বা অন্যান্য ঘটনা ঘটেছে তখনই সেই আপডেট ঢুকেছে। সুতরাং উইকিপিডিয়া শুধু এনসাইক্লোপিডিয়া নয় তা এক চলমান ডাইনামিক নিউজ পেপারও বটে। এই ক্ষমতা ব্রিটানিকা বা এনকার্টা গোছের পুরনো মডেলের এনসাইক্লোপিডিয়ার নেই। তাদের কাছে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম তো অচ্ছুৎ বিষয়। কিন্তু সব ঘটনা থেকেই কিছু না কিছু শেখার থাকে। খবর এবং জ্ঞানের সীমারেখা ভেঙে দিয়ে উইকিপিডিয়া এনসাইক্লোপিডিয়ার জগতে বিপ্লব এনে দিয়েছে। সংবাদ মূলত তথ্য এবং তথ্যও সংবাদ এই সত্য তারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

(আগামী সংখ্যায়)

শিশু ও খেলনা

অরুণালোক ভট্টাচার্য

মানুষের মগজের শতকরা ৯০ ভাগ গঠনই সম্পূর্ণ হয়ে যায় ৫ বছরের মধ্যে। এই সময়ে যাবতীয় ইন্দ্রিয়গাহ্য তথ্য জমা হয়ে যায় মগজের ফাঁক ফোকরে। এই তথ্যাবলীর সঙ্গে সমীকরণ ঘটে শিশুর জন-নিহিত সঙ্কেতাবলির। সৃষ্টি হয় মনন। এই জন্যেই এক-একটি শিশুর মানসিক গঠন এক-এক রকম। সুতরাং এটা বলাই বাহুল্য যে, বাহ্যিক স্টিমুলাস বা উদ্দীপনা বাড়ন্ত শিশুদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। নবজাতক থেকে কৈশোর, নির্জীব যে সব জিনিস শিশুদের সব সময়ের সঙ্গী হয়ে থাকে, তার মধ্যে খেলনা হল প্রধান। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, সিন্ধু সভ্যতার সময়েও (৩৩০০-১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) শিশুরা খেলনা নিয়ে খেলা করত। ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিস সাহিত্যে কাঠের ইয়ো ইয়ো জাতীয় খেলনার উল্লেখ আছে।

শিশুরা খেলতে খেলতে শেখে, শিখতে শিখতে খেলে। প্রশ্ন হল, খেলনা কতরকমভাবে শিশুকে বাড়তে সাহায্য করে? প্রথমত, যে সব খেলনা শিশুর শরীর গঠনে সাহায্য করে— যেমন সাইকেল, ঠেলে নিয়ে যাওয়া গাড়ি, ছোট ছোট চৌকো আকারের বাক্স বা ব্যাট-বল ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, যে সব খেলনা শিশুর পঞ্চেন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে, যেমন জলে ভাসানোর নৌকা বা জলে ভরা বা জলে ভাসানো খেলনা, যে সব খেলনায় শ্রুতিমধুর আওয়াজ হয়, নরম মণ্ড জাতীয় খেলনা, যা দিয়ে বিভিন্ন আকার সৃষ্টি করা যায় ইত্যাদি। তৃতীয়ত, যে সব খেলনা শিশুদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে, যেমন ধরা যাক রান্নাবাটি বা ছোট ছোট পুতুলদের জামাকাপড় পরানো বা বিভিন্ন ধরনের যানবাহন নিয়ে সেগুলোকে চালনা করা। এবারে বলি, সেই সব খেলনা, যা বুদ্ধির বিকাশ ঘটায় বা উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে। যেমন— মডেল তৈরি করা বা ছবি আঁকা বা কাগজে মুড়ে বা ভাঁজ করে জাপানি ওরিগামি। কিছু খেলনা আছে, যেগুলো মগজাস্ত্রে শান দেওয়ায় বা আঙ্কিক দক্ষতা বাড়ানোর জন্যে প্রসিদ্ধ। যেমন, দাবা বা স্ক্র্যাবল বা অ্যাবাকাস। এই খেলনার ভাগ কিন্তু অনেকটাই আপেক্ষিক। একটা খেলনাই অনেক রকমভাবে শিশুকে গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। যেমন, একটি সাইকেল। সেটি যেমন শিশুটির মাংসপেশীর গঠনে সাহায্য করছে, আবার একই সঙ্গে তাকে রাস্তায় চলাফেরা করার প্রাথমিক শিক্ষাও দিচ্ছে।

এইবার দেখা যাক, কীভাবে খেলনা শিশুদের মননের বিকাশ ঘটায়। শিশু তার অভিজ্ঞতা থেকে এই জগৎ সম্বন্ধে আস্তে আস্তে একটা ধারণা গড়ে তোলে। দু-একটা উদাহরণ দিই— মাঝে মাঝে দেখা যায়, কোনও শিশু মনের সুখে লাঠি দিয়ে ড্রাম জাতীয় কিছু পিটিয়ে দারুণ আনন্দ পাচ্ছে। আপাতনিরীহ এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে শিশুটি শিখছে, ফাঁপা বস্তুতে আঘাত করলে আওয়াজ বের হয় এবং বস্তুটির আকারের তারতম্য ঘটিয়ে বা আঘাতের অভিঘাতের তারতম্য ঘটিয়ে শব্দের তীব্রতাও কমানো-বাড়ানো যায়। আবার কোনও শিশুকে হাতের জিনিস ফেলে দিয়ে আনন্দ পেতে দেখা যায়। যতবার জিনিসটি দেওয়া হয়, সে খুশি হয়ে নেয়, যেন ফেলে দেওয়ার জন্যেই। আপাতদৃষ্টিতে দেখা এই দুষ্টুমির মধ্যে দিয়ে কিন্তু শিশুটির অবচেতনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে, কোনও বস্তুকে ফেলে দিলে সেটি উপরের দিকে না উঠে নীচের দিকে পড়ে। মাধ্যাকর্ষণের একেবারে প্রাথমিক ধারণা প্রোথিত হয় শিশুটির অবচেতন মনে। আবার শিশু যখন কতগুলো ব্লক দিয়ে একটি কাঠামো গড়ে তুলছে বা কিছু টুকরো জুড়ে একটি বাড়ির ধাঁচ তৈরি করছে, সেখানে শিশুটির বুদ্ধি, দৃষ্টি, সূক্ষ শিল্পবোধের মেলবন্ধন ঘটে। সামঞ্জস্য বোধও গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে। একটি শিশু যখন একটি ধাঁধার সমাধান করে ফেলে বা সাইকেল চালানো শিখে ফেলে কিংবা ব্যাটে-বলে সঠিক সংযোগ ঘটিয়ে ফেলে, তার মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে আত্মবিশ্বাস, সে ভাবতে শেখে, 'আমিও পারি'। পরবর্তী পর্যায়ে, তার বোধোদয় হতে থাকে সামাজিক জীব হিসাবে। যখন অনেকগুলি শিশু একসঙ্গে কোনও দলবদ্ধ খেলায় অংশ নেয় বা অনেকে মিলে কোনও ভাস্কর্য বা ছোটখাটো স্থাপত্য গড়ে তোলে, তখন সে অনুধাবন করে যে, অন্যের সাহায্য ছাড়া কিছু জিনিসে, জীবনে সাফল্য আসতে পারে না। যৌথভাবে বাঁচা বা সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রাথমিক পাঠ শুরু হয়ে যায় খেলনা নিয়ে খেলার মাধ্যমেই। বিভিন্ন বয়সে শিশুদের মানসিক এবং শারীরিক বিকাশের যে সারণী, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই তৈরি হয় বিভিন্ন বয়সের খেলনা। বিজ্ঞানীরা নিরন্তর কাজ করে চলেছেন বয়সভিত্তিক বিভিন্ন খেলনা তৈরির জন্য।

দেখা যাক, কীভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খেলনার বিবর্তন ঘটে চলেছে। সিন্ধু সভ্যতার সময়ের মাটির চাকার মতো দেখতে খেলনা বা খেলনার রূপে গৃহপালিত পশুর প্রতিচ্ছবি থেকে শুরু করে আজ ভার্চুয়াল রিয়্যালিটির খেলনা! খেলনার জগৎ আর শিশুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বড়রাও ঢুকে পড়েছে। খেলনা এবং শিশুদের মানসিক বিকাশের যে সম্পর্ক, তা নিয়ে পৃথিবী জুড়ে কাজ হচ্ছে। ব্যারি কুদ্রোইৎস নামে এক খেলনা ডিজাইনার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে স্নাতক হওয়ার পরে, ওখানে খেলনার উপরে কোর্স করান। এমআইটি-তে অদূর ভবিষ্যতে এই কোর্সে ঢুকে পড়বে ডেভেলপমেন্টাল সাইকোলজির কিছু অংশ। উদাহরণ হিসাবে এমআইটি-র কথা উল্লেখ করলাম, এরকম সারা পৃথিবী জুড়েই খেলনা নিয়ে কাজ চলছে। বোঝাই যাচ্ছে, খেলনা শুধুমাত্র শিশুদের বিনোদনের মাধ্যম নয়, তার পরিমার্জন এবং পরিবর্তন আজ গবেষণার বিষয়। ফলে আজকের খেলনায় বয়সভিত্তিক বিভাজন পাই। কোন বয়সে কী খেলনা শিশুকে দেওয়া উচিত তা প্যাকেটের গায়েই নির্দেশিত। কোন খেলনা শিশুদের মনের ওপরে খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিয়েও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্দেশিকা থাকে। বিগত এক দশকে খেলনার জগতে যে বৈচিত্র্য এসেছে, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। ইলেকট্রনিক এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে খেলনার জগতেও বিপ্লব ঘটে গেছে। কম্পিউটার গেমস আজ বাসা বেঁধেছে মুঠোর মধ্যে, মোবাইল ফোনের ভেতরে।

খেলনা যে শিশুর মানসিক বিকাশে সাহায্য করে, এ নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। কিন্তু সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা কি আজ একটু নিঃসঙ্গ? একান্নবর্তী পরিবার উধাও, খেলার জন্য পার্ক বা মাঠ নেই, হোমটাস্কের চাপে খেলার সময় নেই, শিশুরা আজ ঘরকুনো এবং একা। তারও তো মনোরঞ্জন দরকার। কর্মরত বাবা-মা সেটা বুঝতে পারেন, কিন্তু সময় দিতে পারেন না। অগত্যা শরণাপন্ন হন খেলনার। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শিশুরা সুযোগ নেয় এই অসহায়তার। ফলস্বরূপ কিছু শিশু হয়ে পড়ছে খেলনাগ্রস্ত। তাদের আচার ব্যবহারের ওপরে এসে পড়ে খেলনা বা খেলনায় ব্যবহৃত কিছু চরিত্রের প্রভাব। সেই প্রভাব কোনও কোনও সময়ে এতটাই প্রবল হয় যে, তা শিশুটির ব্যক্তিসত্তা প্রকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ দাবি করেছেন, খেলনার সংখ্যাধিক্য শিশুর মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটায়। অনেকগুলো খেলনা একসঙ্গে পেয়ে গেলে শিশুটির মনঃসংযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং কোনও একটি নির্দিষ্ট খেলনা নিয়ে তার ভাবনা বা কল্পনার অবকাশ কমে আসে। প্যাট্রিসিয়া কোহল, ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট ফর লার্নিং অ্যান্ড ব্রেন সায়েন্সেস-এর সহ পরিচালক এবং তাঁর দলের সদস্যরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শিশুদের বিকাশের জন্য মানুষজনের সংস্পর্শে থাকা খুব জরুরি। খেলনা কখনই সঙ্গী হিসাবে মনুষ্য সঙ্গের বিকল্প হতে পারে না। বিদেশের বহু প্লে স্কুলে আজকাল খেলনার আধুনিকীকরণের পরিবর্তে জোর দেওয়া হচ্ছে সেই ধরনের খেলায়, যেখানে বন্ধুবান্ধবদের যোগদান আবশ্যিক। পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের আদানপ্রদানের মাধ্যমে মানসিক বিকাশ হয়তো আরও ত্বরান্বিত হয়।

যদিও আমাদের আলোচনা খেলনা ও শিশুর মানসিক বিকাশকে কেন্দ্র করেই, তবুও খেলনা কিনতে যাওয়ার সময়ে বা শিশুর খেলার সময়ে কী কী জিনিস খেয়াল রাখা উচিত সে ব্যাপারে দু-চার কথা না বললেই নয়। প্রথমত, খেলনায় ব্যবহৃত রং যেন সীসা রহিত এবং বিধিসম্মত হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যাটারি চালিত খেলনা হলে, সর্বদা সজাগ থাকতে হবে শিশুটি ঐ ব্যাটারি যেন গিলে না ফেলে। তৃতীয়ত, খেলনাটি যেন খুব ধারালো না হয়, যেখান থেকে শিশু আঘাত পেতে পারে। সর্বশেষে খেলনাটির মধ্যে এমন কিছু থাকবে না, যা শিশুর শারীরিক বা মানসিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বিভিন্ন দেশে কিছু নিয়ামক সংস্থা আছে, যাদের অনুমতি বিনা খেলনা তৈরি বা আমদানি করা যায় না। আমাদের দেশে এরকম কোনও সংস্থা নেই। ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস শুধুমাত্র নিরাপদ খেলনার কিছু মান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, কিন্তু খেলনা তৈরি বা আমদানির ক্ষেত্রে তার কোনও ভূমিকাই নেই।

বয়স বুঝে, সঠিকভাবে নির্দিষ্ট খেলনা যদি ব্যবহার করা যায়, তবে তা হয়ে উঠতে পারে শিশুদের আত্মার আত্মীয়, মননের অবলম্বন।

তথ্যসূত্র ঃ

১। Children and Toys - NNCC. Lagoni, L.S. Martin, D.H., Maslin-Cole, C., Cook, A., Maclsaac, K. Parrill, G., Bigner, J., Coker, E., & Sheie, S.

২। The Negative Effects of Too Many Toys and What To Do About It - Natalie.

৩। Toy - Wikipedia

৪। Toy Stories - Etienne Benson

৫। What the Research says : Impact of Specific Toys on Play - The National Association for the education of Young Children (NAEYC).

উমা

‘হঠাৎ মৃত্যু’ ঠেকানোও যায়

গৌতম মিস্ত্রী

হঠাৎ মৃত্যু মানে কিন্তু সবসময় পাকাপাকিভাবে মারা যাওয়া নয়। ডাক্তারি পরিভাষায় এর নাম— ‘সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ’। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও আইন অনুযায়ী মস্তিষ্কের মৃত্যু না হলে কেউ সত্যিই মারা গেছেন, এ কথা বলা যায় না। যদিও কোনো অজ্ঞাত কারণে, একটি অপ্রয়োজনীয় প্রচলিত প্রথা অন্ধভাবে অনুসরণ করে ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর অন্তিম কারণ হিসাবে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কর্মকাণ্ড থেমে যাওয়ার (কার্ডিও-রেস্পিরেটরি ফেলিওর) কথাই উল্লেখ করা হয়ে থাকে! নিউমোনিয়া, সাপের কামড় বা অন্য যে কোনো কারণে মারা গেলেও মৃত্যুকালে একসময় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও শ্বসন যন্ত্রের বাতাস টানা-ছাড়া একসময় বন্ধ হতে বাধ্য। এরকম অজস্র মৃত্যুর কারণে কার্ডিও-রেস্পিরেটরি ফেলিওর বা হার্ট থেমে যাওয়ার উল্লেখ, অন্য কোনও বার্তা বহন করে না। ‘আমার বাবা একটি পুরুষ মানুষ’ কথাটার মতো অতিকথন; আসল তথ্য অজানার দুর্বলতা ঢাকা দেওয়া, এক নিছক গোঁজামিল।

মৃত্যু ঘোষণার বিধি বা মৃত্যু নামক দুর্ঘটনাকালীন শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর কাজ স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পরম্পরাগুলো এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। কেবল জেনে রাখা দরকার- মস্তিষ্কের মৃত্যুই পাকাপাকি মৃত্যু বলে মেনে নিচ্ছে বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান। মস্তিষ্কের মৃত্যু অপরিবর্তনীয়। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস বা অন্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে, সাময়িক অথবা স্থায়ীভাবে থেমে গেলেও আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি মস্তিষ্ককে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম। এতে মানুষটির কৃত্রিম উপায়ে টিকে থাকা চলে। অসুস্থ হার্ট, ফুসফুস, কিডনি ইত্যাদি সহ অন্যান্য অঙ্গকে কাজ চালানোর মতো করে মেরামত করে নেওয়া বা ওষুধ ও যন্ত্রের দ্বারা অকেজো অঙ্গগুলোর কাজ সাময়িকভাবে করে নেওয়া সম্ভব। মস্তিষ্কের চেতনার আধার সেরিব্রাল কর্টেক্সের পুনরুজ্জীবন অসম্ভব হলেই হার স্বীকার করে নেওয়াটা দস্তুর। যদিও এমন বেয়াড়া খামখেয়ালিপনা হৃদয়ের পক্ষে বিরল। অকস্মাৎ কোনো কারণে হৃদপিণ্ডের ধুকপুকুনি থেমে গেলে মস্তিষ্ক সহ শরীরের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে রক্ত সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে। মস্তিষ্কে অক্সিজেন ও গ্লুকোজ বহনকারী তাজা রক্ত মোটামুটিভাবে তিন মিনিটের বেশি পৌঁছতে না পারলে মস্তিষ্কের কোষের নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ হৃদ্‌স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেলে তড়িঘড়ি কোনও উপায়ে (কার্ডিও রেস্পিরেটরি রিসাসিটেসন) মস্তিষ্কে অক্সিজেন ও গ্লুকোজ বহনকারী তাজা রক্ত সরবরাহ করতে পারলে তখনকার মতো মস্তিষ্কের (বকলমে মানুষটির) মৃত্যু এড়ানো যায়।

২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে স্পেনের ফুটবল মাঠের একটি দুর্ঘটনার কথা অনেকেরই মনে আছে। ২২ বছরের এক তরতাজা ফুটবলারের মাঠেই অকস্মাৎ মৃত্যুর খবর কাগজের শিরোনাম হয়েছিল। খেলোয়াড়টির নিথর দেহ প্রাণস্পন্দন থাকা অবস্থায় হাসপাতাল অবধি পৌঁছতে পারে নি। মৃত্যুর কারণ হিসেবে দীর্ঘক্ষণ হৃদস্পন্দন থেমে যাওয়াকে দায়ী করা হয়েছে (The death was caused by postanoxic encephalopathy and a multiple failure of his organs caused by the prolonged cardiac arrest...)।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো আপাতসুস্থ ব্যক্তির হঠাৎ মারা যাবার দুঃসংবাদ আমরা আকচার শুনে থাকি। এদের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ সৌভাগ্যবানের পুনরায় বেঁচে ওঠার সুযোগ মেলে ত্বরিতগতিতে যথোপযুক্ত চিকিৎসা প্রয়োগের ফলে। যারা ‘প্রায় মৃত্যুর’ মুখোমুখি হয়েও পুনর্জীবিত হলেন, তাঁদের একটা তকমা দেওয়া হয়ে থাকে— ‘প্রায় মৃত্যুর কবল থেকে

রক্ষা পাওয়া ব্যক্তি' (survivors of sudden cardiac death,অথবা কেবল 'sudden cardiac death')। মোটামুটি স্বীকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী, আপাতসুস্থ ব্যক্তির আগের থেকে কোনো পূর্বাভাস ছাড়া ও আঘাতজনিত কারণ ছাড়া দুর্ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু বা প্রায় মৃত্যু হলে এমনটা বলা যাবে। (Myerburg RJ. Sudden death. J Continuing Educ Cardiol. 1978; 13:15 19)। তথাকথিত হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হলে হৃদপেশি অংশত পাকাপাকি অকেজো হয়ে যাবার ফলে মানুষটিকে আগের সুস্থ অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে, সেরকম ক্ষেত্রে এই শব্দবন্ধ (হঠাৎ মৃত্যু) ব্যবহারের রীতি নেই। প্রায় মৃত্যুর অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠা এই মানুষদের (হঠাৎ মৃত্যু, সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ) প্রায় মৃত্যুর অন্তিম কারণ হিসাবে মারণাত্মক হৃদস্পন্দনের ছন্দপতনের (cardiac arrhythmia) রোগ দায়ী বলে অনুমান করা হয়। এইরকমের প্রাণঘাতী হৃদ-ছন্দপতনের রোগ অবশ্য একদম বিনা কারণে হয় না। মুশকিল হল এই সব কারণের অধিকাংশই শরীরে নীরবেই অর্থাৎ কোনও রোগ লক্ষণ ছাড়াই বাড়তে থাকে। ফলে রোগ নির্ণয় হয় না। 'প্রায় মৃত্যু' বা 'হঠাৎ মৃত্যু'-র কবল থেকে রক্ষা পাওয়া বা না পাওয়া ব্যক্তিদের হৃদয়ে পরবর্তীকালে পরীক্ষা নিরীক্ষা বা অটোপসি করে যে সব রোগের অস্তিত্ব পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হল—(১) হাইপারট্রোফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি (একটি জন্মসূত্রে পাওয়া জিনগত রোগ), (২) অস্বাভাবিক করোনারি ধমনীর উৎসজনিত রোগ, (৩) হৃৎপিণ্ড থেকে উৎস প্রধান ধমনীর দেওয়াল পাতলা ও ভঙ্গুর হয়ে ফেটে যাওয়ার সমস্যা (র‍্যাপ্চারড অ্যাওর্টিক অ্যান্যুরিজম), (৪) হৃদপিণ্ড থেকে প্রধান রক্তনালীতে রক্ত নির্গমনের পথের অ্যাওর্টিক ভ্যাল্ব সরু হয়ে যাবার রোগ (অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস) ইত্যাদি কমবেশি ২০ রকমের রোগ। এই রোগগুলো এমনিতেই বেশ বিরল, আর সেইজন্যই বোধহয় প্রথাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফাঁকফোকর গলে বেরিয়ে যায়, ধরা পড়ে না। এক সমীক্ষায় ১৯৮০-২০০০ সালের মধ্যে খেলোয়াড়দের খেলার সময় মোট ২০ জনের হঠাৎ মৃত্যুর বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের মধ্যে যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এঁদের কারোরই কোনো জানা শারীরিক সমস্যা ছিল না। মারা যাওয়ার পরে এদের ওপরে উল্লেখ করা হাতেগোনা রোগগুলোই নির্ণীত হয়েছে। এই সমীক্ষার চূড়ান্ত মতামত হিসাবে খেলোয়াড়দের গতানুগতিক প্রথাগত পরীক্ষায় সত্যিকার রোগ ও ঝুঁকি নির্ণয়ের অক্ষমতাকে দায়ী করা হয়েছে। (A Review of Sudden Cardiac Death in Young Athletes and Strategies for Preparticipation Cardiovascular Screening, Mishae C. Koester, J Athl Train,. 2001 Apr-Jun; 36(2): 197-204, PMCID: PMC 155532)।

যাঁরা বেঁচে রইলেনঃ

হঠাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যাঁরা বেঁচে গেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি অনুকূল ঘটনা ঝড়ের গতিতে ঘটা চাই। প্রথমত, দুর্ঘটনার সময় কাছেপিঠে কৃত্রিম উপায়ে বুকে চাপ দিয়ে ও মুখে মুখ লাগিয়ে 'কার্ডিও রেসপিটোরি রিসাসিটেশন'-এর মাধ্যমে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ চালু রাখতে প্রশিক্ষিত ব্যক্তির উপস্থিতি দরকার। এরপরে অসুস্থ ব্যক্তিটিকে ত্বরিৎগতিতে আপতকালীন হৃদরোগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে এমন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। যতক্ষণ না হাসপাতালের ইন্টেন্সিভ কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিটের বিছানায় কৃত্রিম ও যান্ত্রিক উপায়ে হৃদস্পন্দন ও শ্বসন প্রক্রিয়া চালু করা যাচ্ছে, হাতের তালু ও মুখের ফুঁ দ্বারা কার্ডিও-রেস্পিরেটরি রিসাসিটেশন চালু রাখতে হয়। এই ব্যাপারটা সবারই শিখে রাখা উচিত। এমনকি মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্যক্রমে, অফিস-কাছারিতে, ক্লাবে সব জায়গাতেই শেখানোর উদ্‌যোগ রাখা দরকার। অকুস্থলে এর প্রয়োগের জন্য দুজন প্রশিক্ষিত ব্যক্তি হলে ভাল, তবে একজনেও কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। এ বিষয়ে মাঝে মাঝে স্বল্পবিস্তর প্রশিক্ষণের কার্যক্রম দেখা যায়।

এইরকম বিরল বেঁচে থাকা মানুষের হৃদস্পন্দন হঠাৎ থেমে যাওয়ার তাৎক্ষণিক কারণ হিসাবে হৃদস্পন্দনের প্রাণঘাতী ছন্দপতনের (ভেন্ট্রিক্যুলার টাকিকার্ডিয়াক বা ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন) রোগকে দায়ী করা হয়। হৃৎপিণ্ডের পর্যায়ক্রমে সঙ্কোচন-প্রসারণের জন্যে একটা সুনির্দিষ্ট ক্রমে তড়িৎ প্রবাহ হৃৎপেশিতে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তবলায় চাঁটি মারার ব্যাপারটা স্মরণ করুন। নির্দিষ্ট ছন্দ মেনে চাঁটি মারলে সেটা সঙ্গীত, এলোপাতাড়ি পেটালে কান ঝালাপালা, কিচ্ছুটি শোনা যায় না। স্বাভাবিক হৃদস্পন্দন হল তবলা লহড়া, ভেন্ট্রিক্যুলার টাকিকার্ডিয়া বা ভেন্ট্রিক্যুলার ফিব্রিলেশন হল আনাড়ির তবলায় চাঁটি। ভেন্ট্রিক্যুলার ফিব্রিলেশন বেনিয়মে প্রচণ্ড গতিতে হৃৎপিণ্ডের প্রধান প্রকোষ্ঠ, নিলয়ের পেশিতে বেনিয়মের তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে। ফলে নিলয় কার্যকারী সংঙ্কোচন-প্রসারণ করতে পারে না। সমস্ত শরীরে রক্তপ্রবাহ থমকে যায়। এমন ক্ষেত্রে আপৎকালীন ব্যবস্থা

হিসাবে কার্ডিও-রেসপিটোরি রিসাসিটেশনের সাহায্যে রক্তপ্রবাহ ও শ্বাসপ্রশ্বাস চালু রেখে যত শীঘ্র সম্ভব 'ডিফিব্রিলেটর' যন্ত্রের মাধ্যমে সমগ্র হৃৎপেশিকে পেশির অভ্যন্তরীণ তড়িৎ বিভবের (electrical potential) মাত্রার চেয়ে বেশি বিভব মাত্রায় ক্ষণিক প্রভাবের প্রয়োগে (defibrillate, shock) অক্ষম ও বেনিয়মের তড়িৎ সৃষ্টিকারী সার্কিটটাকে নিষ্ক্রিয় করা হয়। এরপরে স্বাভাবিক নিয়মের তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়ে আপনা হতেই হৃদপেশির সঙ্কোচন আর প্রসারণের নিয়ন্ত্রণ নিজ আয়ত্তে নিয়ে নেয়। এই ডিফিব্রিলেটর যন্ত্র না থাকলে বা এর বন্দোবস্ত করে শক প্রয়োগের দেরি হলে অনেক সময় বুকের মাঝখানে ঘুসি মারার বা 'থাম্পিং' (precordial thumping) প্রয়োগের চল আছে। বুকের নীচের অংশের মাঝখানে হাত মুঠো করে কড়ে আঙ্গুলের দিক দিয়ে মাঝারি শক্তির ঘুসি মারা হয়। যদিও এর কর্মক্ষমতা ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে প্রতিকূল মত অছে। এর প্রবক্তাগণ বলে থাকেন (Kohl et al, 2005), থাম্পিংয়ের যান্ত্রিক শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত হয়ে ডিফিব্রিলেশনের কাজ কিছুটা হয়ত করতে পারে। ভেন্ট্রিক্যুলার টাকিকার্ডিয়া বা ভেন্ট্রিক্যুলার ফিব্রিলেশনের চেয়ে হৃৎপিণ্ডে বৈদ্যুতিক প্রবাহ একদম থেমে গেলে (cardiac asystole) থাম্পিং কিছুটা কাজের বলে মনে করা হয়। ডিফিব্রিলেটর যন্ত্র হাতের কাছে থাকলে অবশ্য থাম্পিং পরিহার করাই উচিত।

হঠাৎ মৃত্যু নিবারণ সম্ভব?

যে সব রোগভোগের কারণে 'হঠাৎ মৃত্যু', সমগ্র জনগোষ্ঠীর নিরিখে সেগুলোর সম্ভাবনা এতই কম যে, চোখ বুজে (পোলিও টিকাকরণের মতো) সবার জন্য এই রোগের সম্ভাবনার প্রাথমিক পরীক্ষা- নিরীক্ষা শুধু বাহুল্যই নয়, খরচেও (cost-benefit ratio) পোষায় না। হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথির মতো জিনঘটিত রোগের ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্ক আছে এমন কোনো পরিবারের সদস্য এই রোগে আক্রান্ত জানা থাকলে এই রোগের বাহ্যিক লক্ষণ না থাকলেও প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হিসাবে ইসিজি ও ইকোকার্ডিওগ্রাম সবিশেষ উপকারী। প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার জন্য খেলোয়াড়দের হৃৎপিণ্ড সুস্থ , তা নিশ্চিত করার জন্য অন্তত একবার নির্দিষ্ট ডাক্তারি পরীক্ষার অতিরিক্ত কিছু পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত বলেই মনে হয়। সেই পরীক্ষায় হঠাৎ মৃত্যুর বিরল কারণগুলো নেই, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া প্রায়োজন। প্রথমে শারীরিক কষ্টের বিবরণ, পরিবারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর, শারীরিক পরীক্ষা আর ইসিজি অবশ্য করণীয়। পরে প্রয়োজন মাফিক ইকোকার্ডিওগ্রাফি ও ট্রেডমিল টেস্ট পরীক্ষাও করা হতে পারে।

অনেক সময়ে শোনা যায়, আপাত সুস্থ ও হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি হঠাৎ বাড়াবাড়ি রকমের অসুস্থ হয়ে আপৎকালীন চিকিৎসার ন্যূনতম সময় না দিয়ে হঠাৎ মারা যান। প্রাথমিক রোগ হিসাবে এঁদের হৃদরোগ থাকতে পারে, নাও পারে। হৃদরোগ ছাড়াও সহজে বিদায় দেয় না এমন বেশ কিছু রোগের (অনিরাময়যোগ্য বা ক্রনিক রোগ) অন্তিম পরিণতি হিসাবে হৃদয়ের এই প্রাণঘাতী ছন্দপতন (অ্যারিদ্‌মিয়া, cardiac arrhythmia) রোগীর মৃত্যু ডেকে আনে। 'অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া', 'পালমোনারি থ্রম্বোএম্বোলিসম্' ও ধূমপানজনিত 'ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিস'-এ এমন প্রাণঘাতী হৃদ-ছন্দপতন হতে পারে। হার্ট অ্যাটাকের প্রথম কয়েক ঘণ্টায় এই কারণে বহু মৃত্যু ঘটে হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই। এ ক্ষেত্রে সময়মতো সফল আপৎকালীন চিকিৎসা হিসাবে 'কার্ডিও রেস্পিরেটরি রিসাসিটেশন'-এ রোগীকে তখনকার মতো বাঁচানো গেলেও দীর্ঘমেয়াদি সুস্থতা প্রাথমিক রোগ নিরাময়ের উপরে নির্ভরশীল।

হঠাৎ মৃত্যুকে অনেকে ভুল করে হার্ট অ্যাটাক বলে থাকেন। ডাক্তাররাও অনেক সময়ে জটিলতা এড়াতে গুজবটিকে বিতর্কের নিশানা না করে আত্মরক্ষার্থে ব্যবহার করে থাকেন। হার্ট অ্যাটাকের অপরিবর্তনীয় পরিণতি সামাজিক মান্যতা পেয়ে এসেছে বলে চিকিৎসককে আলাদা করে অপরাধী বনে যেতে হয় না। এতে তাৎক্ষণিক স্বস্তি মিললেও একটা অসত্য প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। গুজব মান্যতা পেয়ে বহু দিন বইপত্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন অতিব্যস্ত চিকিৎসকদেরও বুদ্ধি গুলিয়ে দিয়ে রোগীদের ঠিক চিকিৎসা দিতে ব্যর্থ হয়। হার্ট অ্যাটাকে হঠাৎ মৃত্যু হতে পারে, তবে সেটা হাসপাতালে পৌঁছনোর আগে হলে সামাজিক সচেতনা, বাড়ির কাছের হাসপাতালের পরিষেবার মান ও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাকে দায়ী করে সেটার মানোন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে। হার্ট অ্যাটাকের পরে বা অন্য রোগের ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় হঠাৎ মৃত্যু হলে বুঝতে হবে হাসপাতালের পরিষেবার মান যথাযথ নয়।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা ২০১৬

স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ

স্মৃতিচারণ করছেন সতীশ মণ্ডল

সঙ্গীতশিল্পী গার্গী ঘোষ, পাশে ধ্রুবা দাশগুপ্ত, নিচে শ্রোতারা

লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলায় উৎস মানুষ

রামকৃষ্ণ মিশন ও ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা

রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরে নিবেদিতা কলকাতায় একজন শিক্ষাব্রতী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, প্রধানত বাগবাজারে মেয়েদের একটি স্কুলকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগিনী নিবেদিতার কি কোনও ভূমিকা ছিল, পঞ্চাশের দশক থেকে যা আলোচিত হচ্ছে? বিভিন্ন দিক থেকে বর্তমান নিবন্ধে দেখানো হচ্ছে, রাজনীতিতে নিবেদিতার তেমন কোনো ভূমিকাই ছিল না। রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতাকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল বিবেকানন্দের প্রয়াণের পর। তবে তার জন্য বৈপ্লবিক কার্যকলাপ নয়, মিশনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিই দায়ী।— সম্পাদকমণ্ডলী

স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে বলরাম বসুর বাগবাজারের বাড়িতে ১ মে, ১৮৯৭ আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের শুরু হয়েছিল। ওইদিন সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, যেগুলি উৎস মানুষের জুলাই, ১৯৯৭ সংখ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন' প্রবন্ধে কিছুটা উদ্ধৃত করেছিলাম। বর্তমান প্রবন্ধের জন্য ওই গৃহীত প্রস্তাবগুলির শেষাংশে আবার চোখ বোলানো প্রয়োজনঃ

'...সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও আদর্শ — লোক-সাধারণের সেবা ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান। রাজনীতির সহিত ইহার কোনো সম্বন্ধ নাই।'

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলির সহিত যাঁহার সহানুভূতি আছে বা যিনি বিশ্বাস করেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতে বিশেষ কার্যসাধনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি এই সঙ্ঘে প্রবেশ করিবার অধিকারী।' (স্বামী বিবেকানন্দ, ২য় ভাগ, পৃষ্ঠা ১৫১)

স্বামী বিবেকানন্দ সর্বসম্মতিক্রমে এই সঙ্ঘের সাধারণ সভাপতি এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলকাতা কেন্দ্রের সভাপতি হলেন।

জুলাই ৪, ১৯০২ স্বামী বিবেকানন্দের আকস্মিক প্রয়াণের কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁর প্রিয়তমা শিষ্যা নিবেদিতার লেখা কয়েকটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় (উদাহরণ, প্রথম সংক্ষিপ্ত বিবৃতি, ইন্ডিয়ান মিরর, জুলাই ২২; বেঙ্গলি, জুলাই ১৯; দ্বিতীয় বিবৃতি, ইন্ডিয়ান মিরর, জুলাই ৩১; দ্য স্টেটসম্যান, জুলাই ৩১)। ভগিনী নিবেদিতার এহেন দ্রুত সঙ্ঘচ্যুতি/পদত্যাগের অন্তর্নিহিত কাহিনী তিনি বা রামকৃষ্ণ মিশন প্রথমে প্রকাশ করেনি স্পষ্টভাবে।

ইতিহাসের অধ্যাপক হরিদাস মুখার্জির 'Sri Aurobindo, Sister Nivedita and the Bengal Revolutionaries' শীর্ষক প্রবন্ধ (The Quarterly Review of Historical Studies, Vol. XXXII, pages 86-100) এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন সচিব প্রীতিতোষ রায়ের 'ভগিনী নিবেদিতার রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বিদায়' (সমতট শতকঙ্খ পৃষ্ঠা ৫৯০-৬১১) লেখাটি থেকে বর্তমান প্রবন্ধের অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছি।

ভারতে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা ঠিক কী ছিল, তা বুঝতে পারলে, অন্যান্য তথ্যের আলোকে আমাদের বুঝতে সুবিধে হবে, কেন স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণের পর রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক বেশ খানিকটা বদলে গিয়েছিল।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগে রামকৃষ্ণ মিশন স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে সঙ্গত কারণেই নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর একই প্রতিষ্ঠান তাদের এক প্রাক্তন সদস্যার অবদানের মাধ্যমে দেখাতে চাইল, ওই আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল। ১৯৫৭ সালে স্বামী গম্ভীরানন্দ History of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission প্রকাশ করেন। তাতেই নিবেদিতার ওই ভূমিকার কথা লেখা হয় (৩য় সংস্করণ, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ১৬১-১৬৪)। তিনি লিখেছেন, 'Swami Brahmananda called the Sister to him and asked her to give up politics. She could not. So the only alternative for her was to agree to dissociate herself from the Math and Mission. This he did by a letter dated July 18, 1902.' (Page 162)

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভগিনীকে নিজের কাছে ডেকে তাঁকে রাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করতে বলেন। নিবেদিতা রাজি হন নি। কাজেই তাঁর একটি মাত্র পথই খোলা ছিল— মঠ ও মিশন

থেকে পদত্যাগ করা। ১৮ই জুলাই, ১৯০২ তারিখের চিঠির দ্বারা তিনি এটি করেন।)

গম্ভীরানন্দ আরও লিখেছেন, 'Moreover, when one has a personal predilection for political struggle, while outwardly belonging to a religious establishment wedded to social service, the temptation becomes irresistible. This seems to have happened, most unfortunately, in the case of Sister Nivedita... and she could be inferred to be instinctively predisposed to try those methods in India to oust the British. But we cannot dogmatically assert that she actually participated in revolutionary politics, for according to us, ideological sympathy, convert or overt, is one thing, and field work entirely another...' (Pages 161-152)

(রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রতি ঝোঁক থাকায় সেবামূলক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অংশ হলেও রাজনৈতিক আবর্তে ভগিনী নিবেদিতা দুর্ভাগ্যবশত জড়িয়ে পড়েছিলেন... ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করতে আয়ারল্যান্ডের হোম রুল আন্দোলনের মতো ভারতেও অনুরূপ চেষ্টা করার জন্য তিনি তৈরি ছিলেন। তবে বিপ্লবীদের রাজনীতিতে তিনি সক্রিয় অংশ নেননি। নীতিগত সহানুভূতি এক জিনিস, আর হাতেনাতে কাজ অন্য জিনিস।)

গম্ভীরানন্দ আরও লিখেছেন, ...'could the Math harbour one who talked so loudly about live political issues at the same time she wore the nun's garb?' (page 162)

(সন্ন্যাসিনীর বসন পরেও যে ব্যক্তি সেদিনকার রাজনৈতিক সমস্যার ওপর উচ্চকণ্ঠে কথাবার্তা বলতেন, তাঁকে কি মঠের পক্ষে রাখা সম্ভব ছিল?)

১৯৫৭ সালে গম্ভীরানন্দের History of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission প্রথম প্রকাশিত হলেও ভগিনী নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপের কথা প্রথম লেখেন ফরাসি জীবনীকার লিজেল রেমোঁ।

লিজেল রেমোঁ (Lizelle Reymond) নাম্নী লেখিকা সিস্টার নিবেদিতার ফরাসি জীবনীতে প্রথম নিবেদিতাকে একজন বিপ্লবী হিসেবে দেখান (১৯৪৫)। এটির ইংরেজি অনুবাদ, The Dedicated নিউ ইয়র্কে ১৯৫৩-য় প্রকাশিত হয়। আরও দু বছর পরে এটির বাংলা অনুবাদ নারায়ণী দেবী প্রকাশ করেন। রেমোঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এরপর এসেছেন গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, দেবজ্যোতি বর্মণ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু। খুব সম্প্রতি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি এইসব কাহিনীকে 'প্রথম আলো' উপন্যাসে মর্যাদা সহকারে স্থান দিয়েছেন। সুনীলের অবশ্য কৈফিয়তের পথ খোলা, কারণ তিনি 'প্রথম আলো'র শেষে স্বীকার করে নিয়েছেন, 'বিশুদ্ধ ইতিহাস রচনা আমার কাজ নয়, সে দায়িত্ব আমি নিই নি, সে যোগ্যতাও আমার নেই, আমি উপন্যাস রচয়িতা মাত্র' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠ ৭১০)। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় যে সকল ব্যক্তি শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়কে পরামর্শ ও তথ্যাদি দিয়েছেন, তাঁদের তালিকার প্রথমেই আছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু, যাঁর চারখণ্ডের 'নিবেদিতা লোকমাতা' নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জীর মধ্যেও আছে।

সিস্টার নিবেদিতা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন কিনা বা বিপ্লবী ছিলেন কিনা সেই প্রশ্নেরই আগে জবাব দিতে হবে। একদা শঙ্করীপ্রসাদ বসুই নারায়ণী দেবীর বাংলা অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবন কি ঐভাবে সত্য, যেভাবে লেখিকা দেখিয়েছেন? নিবেদিতার চিঠির কিছু সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ভিন্ন তথ্য-উৎস সম্বন্ধে গ্রন্থমধ্যে আর কোনো উল্লেখ পাইনি। মনে হয়েছিল, অবশ্যই অসাধারণ একটি লেখা পড়লাম, কিন্তু এর সত্য হয়ত কিয়দংশ কবির সত্য—ঐতিহাসিকের সত্য নয়।'

ফরাসি লেখিকা রেমোঁকে কে ঐসব তথ্য জুগিয়েছিল? রেমোঁর সহযোগী জিন হারবার্ট, যিনি ইংরেজি অনুবাদটি লেখেন, ভূমিকায় লিখেছেন—স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী শঙ্করানন্দ এবং গণেশ মহারাজ ১৯৩৮-৩৯ সালে রেমোঁকে বিভিন্ন মূল্যবান তথ্য দেন। অথচ প্রীতিতোষ রায় তাঁর প্রবন্ধে (সমতট দশক, পৃষ্ঠা ৫৯৮) দেখিয়েছেন, স্বামী বিরজানন্দ ১৯০১ নভেম্বর থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত বেলুড় মঠে ছিলেন না, শঙ্করানন্দ মঠে যোগ দেন ১৯০৫ বা ০৬-এ, গণেশ মহারাজ ১৯০৩-এ। কাজেই ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণের (জুলাই ৪) সময় মাত্র পাঁচ মাস নিবেদিতা ভারতে দ্বিতীয়বার এসেছেন, সেই সময় ওই তিনজনের কেউই বেলুড়ে ছিলেন না, বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর বেলুড়ের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিবেদিতার আলোচনা কী হয়েছিল, তাও প্রত্যক্ষ জানতেন না। ১৯৩৮-৩৯ সালে যখন রেমোঁ সংবাদসংগ্রহ করেন, তখন ১৯০২-এর ট্রাস্টিরা সবাই লোকান্তরিত।

প্রীতিতোষ রায় লিখেছেন,

(১) ২০ জুন ১৮৯৯ থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯০২ পর্যন্ত নিবেদিতা ভারতবর্ষে অনুপস্থিত। রেমোঁ লিখেছিলেন, নিবেদিতা নভেম্বর ১৯০১ বিদেশ থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছন।

(২) ১১মে থেকে ২৬ জুন, ১৯০২ নিবেদিতা হিমালয়ের মায়াবতী আশ্রমে গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাচ্ছিলেন। কাজেই এই সময়েও তিনি রাজনীতি করার সুযোগ পাননি। মাত্র তিন মাসে (ফেব্রুয়ারি-মে, ১৯০২) নিবেদিতা ভারতবর্ষে এমন কী রাজনীতি করলেন যে, মিশন তাঁকে সম্পর্কে ছেদ করতে বাধ্য করল? অবশ্য শঙ্করীপ্রসাদ বসু দেখিয়েছেন, লন্ডনের The Review of Reviews পত্রিকার সম্পাদক উইলিয়াম টি স্টেড লিখিত ০৮/১২/১৯০২ ও ০১/০১/১৯০৩ তারিখের চিঠির ছবি থেকে দেখা যায়, নিবেদিতার স্বনামে/বেনামে উক্ত পত্রিকায় লেখা ছাপার সম্ভাবনা (৩য় চিত্রগুচ্ছ, নিবেদিতা লোকমাতা, ২য় খণ্ড, ১৯৯১)। এই লেখাগুলি লর্ড কার্জনের বিপক্ষে ছিল।

(৩) আগস্ট ১৯০৭ থেকে জুলাই ১৯০৯ নিবেদিতা আবার ভারতে অনুপস্থিত, যখন বিপ্লবীদের বোমা, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, ডাকাতি চরমে উঠেছিল।

কিন্তু প্রীতিতোষ দেখিয়েছেন, বিদেশ থেকে দ্বিতীয়বার নিবেদিতা দুজন সঙ্গী ওলি বুল ও রমেশচন্দ্র দত্তকে নিয়ে মাদ্রাজে পৌঁছন ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২। রেমোঁ লিখেছিলেন, নিবেদিতা ডিসেম্বর ১৯০১ কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে ছিলেন, বড় বড় নেতার সঙ্গে আলাপ করেন, সব আলোচনা শুনতেন এবং সভা শেষ হবার পরেও তাঁদের সঙ্গে পত্রালাপ বজায় রেখেছিলেন। বলা বাহুল্য, এগুলি সবই মিথ্যা। রেমোঁ এও লিখেছিলেন, নিবেদিতা আয়ারল্যান্ডের সশস্ত্র সংগ্রামের কথা জানতেন ও আইরিশ বিপ্লবীদের চিনতেন। প্রীতিতোষ উত্তর দিচ্ছেন— ১৮৬৭-তে, নিবেদিতার জন্মসালে আইরিশ বিদ্রোহ হয়েছিল। তারপর যে বিদ্রোহ হয়, তা ১৯১৬-তে, যার ফলে আয়ারল্যান্ডে স্বাধীন হয় ১৯২১-এ। এদিকে ১৯১১-তেই নিবেদিতা দার্জিলিঙে মারা যান। তাই নিবেদিতার জীবনকালে কোনোস্বাধীনতা আন্দোলন বা আইরিশ গুপ্তসমিতির বালাই ছিল না।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিতার ভূমিকা নিয়ে গিরিজাশঙ্কর থেকে শঙ্করীপ্রসাদ বেশ কয়েকটি দাবি করেছিলেন। সেগুলি একে একে হরিদাস মুখার্জি তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধে খণ্ডন করেন। তা ছিল এরকম: (১) 'নিবেদিতাই ১৯০২ সালের বরোদা সফরের সময় শ্রীঅরবিন্দকে বিপ্লবী হতে উদ্বুদ্ধ করেন।' হরিদাসবাবুর উত্তর, ১৮৯৩ সালেই অরবিন্দ কেম্ব্রিজে ছাত্রাবস্থায় Indian Majlis-এর সদস্য ও সেক্রেটারি হিসেবে বিপ্লবীদের মতো বক্তৃতা দিতেন, যার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ICS হতে দেয়নি। এছাড়া ভারতে ফিরে অরবিন্দ বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় পর পর অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন, যাতে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ছিল। তখনও নিবেদিতা ভারতে পা রাখেননি। (২) 'নিবেদিতা রাজাবাজার আখড়া বা যতীন ব্যানার্জির গুপ্ত সমিতির সদস্যা ছিলেন ১৯০২ থেকেই।' নিবেদিতা এই আখড়ার লাইব্রেরিতে অনেকগুলি বই তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে দান করেন ঠিকই, কিন্তু ওই আখড়ায় প্রথমদিকে তেমন কোনো বৈপ্লবিক কার্যকলাপ হত না। তা শুরু হয় পরে। প্রথমে শরীরচর্চা, ব্যায়াম ইত্যাদি হত।

ওই আখড়ার বিপ্লবীদের একজন প্রাচীনতম সদস্য অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য হরিদাসবাবুকে জানিয়েছেন, ওই বইগুলি দেওয়া ছাড়া নিবেদিতা অন্য কোনোভাবে আখড়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। (৩) 'কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটির ভিত্তি ছিল নিবেদিতার শিক্ষাসংক্রান্ত চিন্তাধারা। এখানেই তিনি তরুণদের revolutionary terrorism-এর শিক্ষা দিতেন।' প্রথমে রেমোঁ ও পরে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী এই গল্পটি চালু করেন। হরিদাসবাবু লিখেছেন, এটি বানানো গল্প। ডন সোসাইটির মূলে ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখার্জী এবং এই সমিতির পত্রিকা পড়লেই বোঝা যায়, নিবেদিতার শিক্ষাসংক্রান্ত চিন্তাধারার বিষয়ে সতীষচন্দ্র জানতে পারেন অনেক পরে। নিবেদিতা মাঝে মাঝে সেখানে বক্তৃতা দিতেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির বিষয়গুলিতে। নিবেদিতা সেখানে কখনই উগ্র রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ প্রচার করেননি, শঙ্করীপ্রসাদ বসু যা বলতে চেয়েছেন। বৈষ্ণবভাবাপন্ন সতীশচন্দ্র সহিংস আন্দোলনের দিকে কখনই ছিলেন না। (৪) অরবিন্দের অনুরোধে নিবেদিতা পাঁচ সদস্যের Central Executive Committee-তে ছিলেন, ব্যারিস্টার পি মিত্র ছিলেন যার প্রেসিডেন্ট।'

অরবিন্দ লিখে গিয়েছেন, তিনি নিবেদিতাকে ওই কমিটিতে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিবেদিতা তাতে সম্মত হয়েছিলেন এমন লেখেন নি। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে হরিদাসবাবু জেনেছেন, নিবেদিতাকে দলে পাওয়া যায়নি। (৫) ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য মুখপত্র ছিল যুগান্তর সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথমে লিজেন রেমোঁ ও পরে গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন, ওই পত্রিকায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বারীন ঘোষের লেখাগুলি ছিল নিবেদিতার নির্দেশে লেখা। কিন্তু রেমোঁর বই প্রকাশিত হবার পরেও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বেশ কিছু বছর জীবিত ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন সাপ্তাহিক যুগান্তরের সম্পাদক। তিনি এবং পত্রিকার ম্যানেজার অবিনাশ ভট্টাচার্য দুজনেই লিখে গিয়েছেন রেমোঁর এবং গিরিজাশঙ্করের ওই ঘটনাটি বানানো এবং নিবেদিতা কখনই যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। ওপরের (৪) নম্বর পয়েন্ট সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর

নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে অনুরূপ কথা লিখেছিলেন, তা প্রীতিতোষ রায়ের লেখায় সবিস্তার দেখানো হয়েছে। ভারত পরিক্রমার সময় নিবেদিতা রাজনৈতিক অভিমত প্রকাশ করে থাকলেও তাঁকে রাজনীতিক বলা যায় না, শ্রীরায় লিখেছেন। তাহলে স্বামী বিবেকানন্দ, কবি হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকেও রাজনীতিক বলতে হয়। ১৯০৫ সালে বারাণসীতে জাতীয় কংগ্রেসের সভায় নিবেদিতা গিয়েছিলেন, তবে কোনো বক্তৃতা দেননি। প্রীতিতোষ আরও দেখিয়েছেন, রামকৃষ্ণ মিশনের তিনজন স্তম্ভ— স্বামী অভেদানন্দ, বিজ্ঞানানন্দ ও প্রভবানন্দ আমেরিকায় বা ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষে বিবৃতি বা কাজকর্ম করে থাকলেও সেই কারণে তাঁদের মিশন-বহির্ভূত করা হয় নি।

তাহলে স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর নিবেদিতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কী ধরনের বিচ্ছেদ হয়েছিল?

এ বিষয়ে Indian Mirror সংবাদপত্রে ২২ জুলাই, ১৯০২, স্বামীজির প্রয়াণের ১৮ দিন পরে, একটি ছোট্ট ঘোষণা ছিল:

Sister Nivedita begs us to inform the public that, at the conclusion of the days of mourning for the Swami Vivekananda, it has been decided between the members of the Order at Bellur Math and herself, that her work shall henceforth be regarded as free, and entirely of their sanction and authority.

অর্থাৎ বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আলোচনার পর স্থির হয়েছে, অতঃপর নিবেদিতার কাজ হবে স্বাধীন, যার জন্য মঠের অনুমোদন বা নির্দেশ লাগবে না। এই একই খবর আরও ছোট আকারে Bengalee পত্রিকায় ১৯ জুলাইও ছাপা হয়। ১৮ জুলাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে নিবেদিতা একটি চিঠি দেন, যেটি রেমোঁ দেখে তাঁর বইয়ে দেন। এতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'আপনার পত্র আজ পেলাম— আমার পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য যে-কোনো ব্যবস্থা প্রয়োজন আমাকে তাই মেনে নিতে হবে। ...যথাসম্ভব সত্বর সংবাদপত্রে আমার নূতন পরিস্থিতি জানিয়ে দেব। [আংশিক অনুবাদ]

প্রীতিতোষ রায় যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি তুলেছেন, তা হল, স্বামী ব্রহ্মানন্দের ওই পত্রটি রামকৃষ্ণ মিশন বা শঙ্করীপ্রসাদ প্রকাশ করলেন না কেন? স্পষ্টতই, নিবেদিতার ২২ জুলাইয়ের বিবৃতি ও ১৮ জুলাইয়ের চিঠি লেখা হয়েছিল ব্রহ্মানন্দের ওই চিঠিটি পেয়েই। (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২৪-৫২৭)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'প্রথম আলো'য় নিবেদিতার সঙ্গে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন সবিস্তার বর্ণনা করেছেন, যার কেনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এ বিষয়ে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'কিছু কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রকেও আমি বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত করিয়েছি, তাঁদের মুখে সংলাপ বসিয়েছি, তাতে কিছুটা স্বাধীনতা নেওয়া হলেও তা একেবারে তথ্যবহির্ভূত নয়। তাঁদের রচনা, চিঠিপত্র, অন্যদের স্মৃতিকথা থেকে সেইসব পরিবেশ নির্মাণ করা হয়েছে এবং সংলাপ ব্যবহারের স্বাধীনতা তো ঔপন্যাসিককে দিতেই হবে।' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭১১)

নিবেদিতার আরও বিশদ বিবৃতি ছাপা হয়েছিল জুলাই ৩১, ১৯০২ ইন্ডিয়ান মিরর এবং দ্য স্টেটস্‌ম্যানে (বিবেকানন্দ ইন ইন্ডিয়ান নিউজপেপার্স্, পৃষ্ঠা ২২৬)। প্রাসঙ্গিক অংশের অনুবাদ (প্রীতিতোষ রায় কৃত) ....'এই সংঘ তার দুজন মহান গুরু [স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ] ও প্রতিষ্ঠাতার কাছে যে অধ্যাত্ম চিন্তা ও উপলব্ধির নির্দিষ্ট ভাণ্ডার লাভ করেছে, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক— দীনা শিক্ষার্থিনীর, ব্রহ্মচারিণীর।

ধর্ম বিষয়ে আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিশেষ অনুগ্রহ করে তাঁদের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের বহির্বর্তী আমার সামাজিক, সাহিত্যিক ও শিক্ষাগত কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা আমাকে দিয়েছেন। বস্তুত আমার গুরুর মৃত্যুর পর আমার সতীর্থ-শিষ্যদের সঙ্গে, যাঁরা মহিলা নন, সংস্পর্শ কমে যাওয়াই স্বাভাবিক।'...

ইংরেজিতে লেখা মূল বিবৃতিটি দীর্ঘ এবং এটি নিশ্চয়ই নিবেদিতা বেলুড় মঠের নির্দেশেই লিখেছিলেন। প্রথম বিবৃতিটি তিনি সম্ভবত নিজেই প্রস্তুত করেছিলেন, কারণ জুলাই ১৮ তিনি ব্রহ্মানন্দকে চিঠি দেবার পরের দিনই Bengalee-তে তা ছোট আকারে ছাপা হয়েছিল। দুটি প্রকাশিত বিবৃতির কোনোটিতেই রাজনীতির কোনো উল্লেখ নেই। প্রথম বিবৃতিটি খানিক মিশন থেকে বিচ্ছেদের মতনই।

দ্বিতীয় বিবৃতিটি বিশদ, তাতে নিবেদিতা ধর্মরাজ্যে নিজের শিক্ষানবিশি অবস্থা স্বীকার করেছেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের মহত্ত্ব স্বীকার করেছেন, এবং গুরুর মৃত্যুর পর পুরুষ গুরুভাইদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা বাঞ্ছনীয় নয়, এও লিখেছেন। আরেকটি পয়েন্টে মোটামুটি তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে ভারতে তাঁর খুব একটা ভবিষ্যৎ নেই। প্রথম বিবৃতিটির ফলে যা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তার ফলে স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাইরা একটি আপস

করেছিলেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতাকে খানিক দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। ইংরেজিতে বলা যায় She was put in her place. কাজেই এটা স্পষ্ট, নিবেদিতার এই স্বীকারোক্তিগুলির আসল কারণ ছিল, রামকৃষ্ণ সংঘের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যার সম্পর্ক ছিল না।

প্রীতিতোষ রায়ের সঙ্গে অবশ্য একটা ব্যাপারে একমত হওয়া যাচ্ছে না যে, নিবেদিতা সংঘচ্যুতা হননি। স্পষ্টতই তাঁকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। ইন্দ্রনাথ নন্দী যে খুব একটা বিপ্লবী ছিলেন না বা নিবেদিতার সহচরও বেশিদিন ছিলেন না, তা আমরা অধ্যাপক হরিদাস মুখার্জির প্রবন্ধ থেকে জানতে পারি। নিবেদিতার লেখা বইগুলি উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশ করেছিল ঠিকই, তবে তা প্রমাণ করে না, তিনি রামকৃষ্ণ সংঘেরই সদস্যা ছিলেন শেষ অবধি। দূরে ঠেলে দেবার পরও নিবেদিতার সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখে রামকৃষ্ণ মিশন অতিশয় বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিল বলতে হবে।

যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সারাক্ষণ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলতেন, তাঁর শিষ্যদের পক্ষে আসলে স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাদের প্রতি অত্যধিক আগ্রহ ভালো লাগেনি। নিবেদিতাকে আরও আগেই দূরে ঠেলে দেওয়া হত, যদি না স্বামী বিবেকানন্দ জীবিত থাকতেন। গুরুভ্রাতারা লক্ষ্য করেছিলেন, সার চ্যাপম্যান বুল, হেনরিয়েটা মুলার, মিসেস লেগেট, জোসেফিন ম্যাকলাউডরা বিভিন্নভাবে রামকৃষ্ণ মিশনকে অর্থসাহায্য করেছেন অথচ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে কোনও বিশেষ ব্যক্তিগত সম্পর্কের দাবিদার নন। অন্যদিকে, নিবেদিতা যেন স্বামীজির বেশি আপন, যদিও অর্থসাহায্যের দিক থেকে খুব একটা ফলপ্রসূ নন। কোম্পানির পরিভাষায় বলতে গেলে, ১৯০২ সালে গুরুভাইরা ঠিকই বুঝেছিলেন, যে নিবেদিতা যতটা না asset, তার চেয়ে liability অধিক। তাঁকে খানিক দূরে ঠেলে দিলে নারীঘটিত কলঙ্কাদি থেকেও অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

কাজেই স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর নিবেদিতাকে পরিষ্কার তাঁর নিজের অবস্থান বুঝিয়ে দিয়ে এবং বিবৃতির মাধ্যমে সবাইকে পরিস্থিতি জানিয়ে দিয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এবং ১৯১১ সালে নিবেদিতার প্রয়াণের পর রামকৃষ্ণ সংঘ যথেষ্ট শ্রদ্ধাসহকারেই তাঁর স্মৃতিরক্ষা ও লেখার প্রসার বজায় রেখেছে।

একটা কথা হয়ত প্রীতিতোষ রায় ঠিকই অনুমান করেছেন, নিবেদিতার এই দূরে সরে যাওয়ার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর গুরুভাইদের কর্মধারা নিয়ে বিরোধের একটা অন্য প্রকাশ বা re-enactment মাত্র (উৎস মানুষ, জুলাই, ১৯৯৭ দ্রষ্টব্য)। আগেকার ওই প্রবন্ধে সন্ন্যাসীদের কর্মধারা নিয়ে স্বামীজির সঙ্গে যোগানন্দ ও অদ্ভুতানন্দের বিরোধের কথা লেখা হয়েছে।

অদ্ভুতানন্দের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে স্বামীজিকে বেশ নাটক করতে হয়েছিল। তাঁকে নাকি স্বামীজি বলেছিলেন, 'তোমরা মনে করেছ যে, তোমরাই তাঁকে বুঝতে পেরেছ, আর আমি কিছুই পারিনি। ...যাও, কে তোমার রামকৃষ্ণকে চায়? কে তোমার ভক্তি মুক্তি চায়? দেখতে চায় তোমার শাস্ত্র কী বলছে? ...আমি রামকৃষ্ণটামকৃষ্ণ কারুর কথা শুনতে চাইনি। যে আমার মতলব অনুসারে কাজ করতে চায়, তারই কথা শুনবো। আমি রামকৃষ্ণ কি কারুরই দাস নই— শুধু যে নিজের ভক্তি বা মুক্তি গ্রাহ্য না করে পরের সেবা করতে প্রস্তুত, তারই দাস।' (স্বামী বিবেকানন্দ, প্রমথনাথ বসু, ২য় ভাগ, পৃষ্ঠা ১৫৫)

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ' বইটির রচয়িতা পদ্মনাথ ভট্টাচার্য ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি লেখেন ওপরের ঘটনা সম্বন্ধে—

'এই ঝড়ের পর কিঞ্চিৎ বর্ষণও হইয়াছিল; এইরূপ বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কিছু সময় পরে যখন স্বামীজি বাহিরে আসিলেন, তখন ঠাকুরের জন্য যে তাঁর কত ভক্তিবেগ তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন ...আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দাসাণুদাস ...ইত্যাদি। এই ঘটনা হইতে বুঝা গেল যে, তিনি রামকৃষ্ণদেবের যা অভিমত, তাহার অনুকূল ছিলেন না। মানুষ রাগিলেই পেটের কথা বাহির হইয়া যায়— এক্ষেত্রেও বিবেকানন্দ মনের কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলেন--- ফলতঃ 'সর্ব্বতন্ত্র'-স্বতন্ত্র— কাহারো 'দাস' হইবার লোক ছিলেন না— 'দত্ত কারো ভৃত্য নয়।' তবে দল না বাঁধিলে চলে না— তাই গুরু ভ্রাতাদেরসঙ্গে 'আপোষ' করিয়া চলিয়াছেন--- গুরুভ্রাতারাও বুদ্ধিমানের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন যে ইঁহারই নামডাকের সঙ্গে তাঁহাদের গুরুদেবের তথা সম্প্রদায়ের সম্মানগৌরব বিজড়িত। তাই বোধ হয়, এ বিষয়ে অতঃপর আর তাঁহাদের কেহ কোনও বাঙনিষ্পত্তি করেন নাই।' (রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ৫৩) কাজেই নিবেদিতাকে দূরে সরিয়া দেওয়া ছিল স্বামী বিবেকানন্দের দেহান্তের পর বুদ্ধিমানের কাজ।

দ্রষ্টব্যঃ এই প্রবন্ধটি উৎস মানুষ নভেম্বর ১৯৯৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভগিনী নিবেদিতার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রাসঙ্গিক হিসাবে সেটি পুনর্মুদ্রিত হল।- সম্পাদক

আকুপাংচারের বিজ্ঞান নিয়ে দু-চার কথা

প্রিয় সম্পাদক,
উৎস মানুষ

অনেক বাধাবিপত্তি কাটিয়ে অশোকদার মৃত্যুর পরেও 'উৎস মানুষ' নিয়মিত প্রকাশিত হওয়াটা আমাদের সবার আনন্দের। তার জন্য আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই।

'উৎস মানুষ'-এর অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ সংখ্যায় সুব্রত ঘোষের 'বিশ্বাসে মিলায়' শিরোনামের সুলিখিত, তথ্যবহুল, গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি প্রসঙ্গে কিছু বলার উদ্দেশ্যে এই পত্রের অবতারণা। তাও তাঁর 'আকুপাংচার' প্রসঙ্গে— ব্যক্তিগতভাবে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবস্থা থেকে বিগত প্রায় ৪০ বছর ধরে এই চিকিৎসাপদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার সুবাদে।

শুরুতে প্ল্যাসিবো-র বাংলা প্রতিশব্দ 'মনোতোষ', নাকি এর কিছুটা প্রচলিত প্রতিশব্দ 'ছলৌষধি'— কোনটি উপযুক্ত এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা যায়। একইভাবে 'নোসেবো'-র বাংলা প্রতিশব্দ 'বিষৌষধি' করা যেতে পারে।

আকুপাংচার প্রসঙ্গে আলোচনার শুরুতে বলা হয়েছে, 'যদিও চীন দেশে উদ্ভাবিত বলে প্রচলিত আকুপাংচার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে ৫০০০ বছর আগে মধ্য ইউরোপে।...চীন অবশ্য দাবি করে, এর উদ্ভাবনা সে দেশেই।' দু লাইনের এ মন্তব্যটি প্রসঙ্গে আলোচনা একটু বেশিই হয়ে যাবে। এই মন্তব্যটি পড়ে মনে হবে 'চীন' যেন গায়ের জোরে বা অন্যায়ভাবে এমন 'দাবি' করে। আসলে তথাকথিত ইয়োরাপ, ভারত বা চীন ভূখণ্ড বলে নয়, পৃথিবীর নানা অঞ্চলের মানুষই হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় তার নানা রোগকষ্টের উপশমে নানা কিছু পদ্ধতি 'আবিষ্কার' করেছে, যেমন গাছগাছড়া শেকড়বাকড়ের ব্যবহার, গরম সেঁক, সূঁচালো পাথর দিয়ে শরীরের বিশেষ জায়গায় চাপ দিয়ে বা ফুটিয়ে কষ্টের উপশম, রক্তমোক্ষণ, মাটি-পাথরের গুঁড়ো ব্যবহার ইত্যাদি। এইভাবে লাতিন আমেরিকা থেকে ভারত— প্রাচীন সময়ে সব জনগোষ্ঠীই রোগের বিরুদ্ধে গাছগাছড়ার ব্যবহার শিখেছে। কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষে তার বিশেষ বিকাশ, দার্শনিক নানা দিক, তখনকার জ্ঞান অনুযায়ী তার ব্যাখ্যা ইত্যাদি করে একটি বিশেষ রূপ দেওয়া হয় যা 'আয়ুর্বেদ' নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে যদি কেউ মন্তব্য করে যে, 'প্রাচীনকালে আমেরিকা আফ্রিকা চীন-এর মানুষ আয়ুর্বেদের মতো গাছগাছড়ার ব্যবহার জানলেও ভারত দাবি করে যে, আয়ুর্বেদের উদ্ভাবনা সে দেশেই'— তাহলে ব্যাপারটা ঠিক বিজ্ঞানসম্মত মনে হবে না। 'আয়ুর্বেদ' বলতে যা বোঝায়, তার সৃষ্টি ভারতবর্ষেই। একইভাবে শরীরে কোনও রাসায়নিক পদার্থ (তা সে গাছগাছড়ার বন বা বিশেষ ধাতবগুঁড়ো যাই হোক না কেন) না দিয়ে, শরীরের বিশেষ কিছু জায়গায় সূঁচালো কিছু দিয়ে উত্তেজনা দিলে, সেটিও নানা কষ্টের উপশম করে, এ অভিজ্ঞতাও প্রাচীনকালে পৃথিবীর নানা এলাকার মানুষ 'আবিষ্কার' করেছে। এটিই পরে পাথরের সূঁচ, গাছের কাঁটা, পরে ধাতব সূঁচ ফোটানোয় রূপান্তরিত হয়। এবং শুধু ঐ '৫০০০ বছর আগে মধ্য ইয়োরোপে' নয়, অন্যান্য স্থানেও হয়েছে। প্রাচীন আরবে ধাতব শলাকা কানে বা অন্যত্র ফুটিয়ে রোগচিকিৎসার প্রমাণ আছে। শ্রীলঙ্কাতেও। প্রাচীন ভারতে সূচীভেদ চিকিৎসা নামে এক ধরনের চিকিৎসা করা হত। (এ কারণে ভারতীয় ঐতিহ্যে অন্ধ শ্রদ্ধায় অনেকে এর জন্ম ভারতে বলেও দাবি করেন।) এমনকি সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত তাঁর 'গ্রাম্য ও গার্হস্থ্য চিকিৎসক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এদেশে আগে বিশেষ করে বয়স্কা মহিলারা কোমরে সূঁচ ফুটিয়ে সায়াটিকার ব্যথা কমাতেন। আদিবাসী গোষ্ঠীর অনেকের মধ্যে গাছের কাঁটা ফুটিয়ে চিকিৎসার প্রচলন এখনো আছে। কিন্তু এগুলো কোনওটিই 'আকুপাংচার' নয়, যেমন দক্ষিণ আমেরিকার ইনকারা রোগ চিকিৎসায় গাছপালার ব্যবহার করলেও তা আয়ুর্বেদ নয়। 'আকুপাংচার' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'সূঁচ ফোটানো' হলেও 'আকুপাংচার' চিকিৎসা পদ্ধতি বলতে তার নিজস্ব দার্শনিক ব্যাখ্যা, তত্ত্ব, রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার পদ্ধতি ইত্যাদি বোঝায় (যেমন ঐ 'ছি', মেরিডিয়ান ইত্যাদি) এবং এসবের উদ্ভব মোটামুটি ২৫০০ বছর আগে। আর এটি ঘটেছে চীন ভূখণ্ডে। তাই চীন দাবি করুক বা না করুক, এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে, আকুপাংচার বলতে যে বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি এখন বোঝায়, তার উদ্ভব ও বিকাশ চীনেই ঘটেছে। আকুপাংচারের প্রাচীনতম লিখিত গ্রন্থ 'হুয়াং তি মেই চিং' চীনেই পাওয়া গেছে (৪৭৫-২২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে লেখা)। আর আকুপাংচার আসলে চীনের ঐতিহ্যমণ্ডিত চিকিৎসার (ট্রাডিশন্যাল চাইনিজ মেডিসিন বা টিসিএম) একটি অংশ মাত্র, এর অন্যান্য দিক হচ্ছে চাইনিজ হার্বাল মেডিসিন, ছিকুং ও টু ই না নামের বিশেষ ব্যায়াম ও ম্যাসাজ। গত অক্টোবরে চীনে গিয়ে স্পষ্টভাবে জানা গেল, ওখানে আলাদা করে আকুপাংচার পড়ানো হয় না, চি সি এম-ই পড়ানো হয়।

কিন্তু আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষ— বিদেশে আলদাভাবে আকুপাংচার পড়ানোকে তাঁরা খোলামনেই সমর্থন করেন, তার অন্যতম সহজ কারণ সে সব দেশে 'চাইনিজ' হার্বাল মেডিসিন পাওয়া সম্ভব নয়। আকুপাংচারের মূল চীনা প্রতিশব্দ 'ছেন'। 'আকুপাংচার' শব্দটি অর্বাচীন। মাত্র শ'দেড়েক বছর আগে ডাঃ উইলিয়াম টি রাইলে নামক এক ডাচ চিকিৎসক এই শব্দটির প্রচলন ঘটান চীন থেকে ইয়োরোপে প্রসার ঘটানোর সময় ল্যাটিন শব্দ 'অ্যাকাস' (অর্থাৎ সূঁচ)-এর সঙ্গে 'পাংচ্যুরা' (অর্থাৎ ফোটানো)কে মিলিয়ে।

যাই হোক, এ বিষয়ে আর বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে, আকুপাংচার-এর কর্মপদ্ধতির বা ফলাফলের বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি আছে কি না, নাকি তা নিছকই ছলৌষধি-র মতো কাজ করে তা নিয়ে কিছু কথা বলা যায়। বহু হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় আগে মানুষ যে নানা চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, তার মধ্যেই একটি বস্তুবাদী, আদিম বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী আছে। মন্ত্র পড়ে (যেমন অথর্ববেদে) বা অলৌকিক শক্তির তথা ঈশ্বরের দয়ায় নয়, মানুষ নিজে বাস্তব কিছু কাজ করে রোগ সারাতে পারে, এই চিন্তাটাই ছিল বৈপ্লবিক। (যে কারণে আয়ুর্বেদকেও ব্রাহ্মণ্যরোষে পড়তে হয়েছে। তা অন্য প্রসঙ্গ।) এইভাবে প্রাচীন চিকিৎসার অন্যতম পদ্ধতি আকুপাংচারেরও সৃষ্টি। কিন্তু আদিম বিজ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ এইসব পদ্ধতি ঐতিহ্যমণ্ডিত বলেই তাকে মহীয়ান করতে হবে বা তার সবটুকু বিজ্ঞানসম্মত, তা অবশ্যই নয়। যেমন আয়ুর্বেদের নানা ওষুধপত্রের রাসায়নিক উপাদান আলাদা করে, তার উপর বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা করে, সঠিকভাবে তার ব্যবহারই কাম্য। (যেমন ল্যাটিন আমেরিকায় সিনকোনার ছাল প্রবল জ্বরে ব্যবহার করা হত, পরে তার থেকে পাওয়া কুইনাইনই আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে গৃহীত হয়েছে। একইভাবে সর্পগন্ধাকে মানসিক রোগের চিকিৎসায় ব্যবহারের কথা বলা হত, কিন্তু এর থেকে পাওয়া রিসার্পিন উচ্চ রক্তচাপের জন্য স্বীকৃত ওষুধ।) মুশকিল হচ্ছে আয়ুর্বেদের মতো চিকিৎসাতে আমাদের দেশে ঐতিহ্য, ভারতীয়ত্ব (এবং হিন্দুত্ব!), জাতীয়তা ইত্যাদির সঙ্গে মিলিয়ে (নাকি গুলিয়ে) লোক ঠকানো কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করা হচ্ছে। এরই বহিঃপ্রকাশ আয়ুর্বেদের জন্য কোটি কোটি টাকা সরকারিভাবে খরচ করে তার ঐ 'বায়ু পিত্ত কফ' সহ নানা তত্ত্বসমেত প্রয়োগ করা হচ্ছে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তার উপর গবেষণা তুলনায় অনেক কম। এখন থেকে দু-আড়াই হাজার বছর আগে মানুষের তখনকার জ্ঞান অনুযায়ী যে সব অসাধারণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এখনও শুধু তাকেই আঁকড়ে রাখাটা অবৈজ্ঞানিক ধান্দাবাজি।

আকুপাংচারের ক্ষেত্রেও তা সত্যি। শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানের চামড়ায় উত্তেজনা প্রয়োগ করে কেন ও কীভাবে রোগকষ্টের উপশম হয়, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তখনকার জ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তাভাবনা অনুযায়ী কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, যেমন জীবনীশক্তির (ছি), মেরিডিয়ান, ফাইভ এলিমেন্টস থিওরি (অনেকটা পঞ্চভূতের মতো), ইন-ইয়াং ইত্যাদি। এদের সবগুলিকেই যদি এখন হুবহু আঁকড়ে রাখা হয় তবেই মুশকিল। তবু এদের বাস্তব কিছু বিজ্ঞানসম্মত দিক আছে। যেমন ধরা যাক, ইন-ইয়াং। জীবনীশক্তির এই দুই বিপরীতধর্মী কিন্তু পরপর নির্ভরশীল দিকের সামঞ্জস্যে শরীর সুস্থ থাকে, তার বৈকল্যে নানা রোগ বা কষ্ট দেখা দেয়, এমনটা বলা হয়। এমন সিদ্ধান্ত কিছু পর্যবেক্ষণ থেকেই করা হয়েছিল। ঐ অনুযায়ী চিকিৎসা করে ফলও পাওয়া যেত বা যায়। কিন্তু তখন আধুনিক শারীরবৃত্তীয় তত্ত্ব কিছুই জানা ছিল না। তবু এখন আমরা জানি শরীরে (এবং প্রকৃতিতেও) এমন দুই বিপরীত কিন্তু পরস্পর নির্ভরশীল, অচ্ছেদ্য দিকের কথা যেমন হৃদপিণ্ডে সিস্টোল-ডায়াস্টোল, ইনস্পিরেশান-এক্সপিরেশান, অ্যাক্সন-ডেনড্রাইট, সিম্প্যাথেটিক-প্যারাসিম্প্যাথেটিক, অ্যানাবলিজম-ক্যাটাবলিজম ইত্যাদি। এ ব্যাপারটিকে ইন-ইয়াং না বলা যেতেই পারে, কিন্তু মূল পর্যবেক্ষণটি ছিল সঠিক, যেমন সূর্য ও পৃথিবীর আকর্ষণ-বিকর্ষণ, গণিতে যোগ-বিয়োগ, নারী-পুরুষ ইত্যাদি।

মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় দেখেছিলাম, কয়েক মাস অর্থোপেডিক্সে চিকিৎসা করা সায়াটিকার কষ্টে ভোগা এক ব্যক্তি ৪-৫ দিনের আকুপাংচার চিকিৎসায় প্রায় সম্পূর্ণ কষ্টমুক্ত হন। এটিকে ঠিক প্ল্যাসেবো বলে মনে হয় নি। বার্জারস ডিজিজ-এর অসহ্য যন্ত্রণায় ভোগা রোগী দু-এক সপ্তাহের আকুপাংচার চিকিৎসায় ঐ অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্ত পান এবং শেষ পর্যন্ত পা কেটে বাদ দেওয়ার জন্য ভর্তি থাকা ঐ ব্যক্তির পা কাটতে হয় নি। আরো বেশ কয়েকজনের ক্ষেত্রেই তা হওয়ার পর আমাদের সার্জারির অধ্যাপক ডাঃ সুব্রত ব্যানার্জি মন্তব্য করেছিলেন, 'বার্জারস ডিজিজ-এর জন্য আকুপাংচারই দি বেস্ট ট্রিটমেন্ট।' এবং এই সব রোগীর কারো ক্ষেত্রেই ব্যাপারটিকে প্ল্যাসিবো মনে হয় নি। ক্রমশ আরো বহু রোগীর ক্ষেত্রেই এই অভিজ্ঞতা হয়। তাই বলে আকুপাংচারে সব রোগ সেরে যাবে, সব কষ্ট কমে যাবে, তা আদৌ নয়। কিছু ক্ষেত্রে কিছু প্ল্যাসিবো ভূমিকা স্বাভাবিকভাবেই থাকে, কিন্তু তা তুলনায় নগণ্য।

পরবর্তীকালে আকুপাংচার নিয়ে কাজ করতে করতে এর আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি সম্পর্কে ক্রমশ নানা তথ্য জানা সম্ভব হয়। এমন দু-চারটির উল্লেখ করা যায়। দু দল বেড়ালের ২২ফিমোরাল আর্টারি কেটে কৃত্রিম শক অবস্থার সৃষ্টি করা হয় এবং প্রায় একই মাত্রা পর্যন্ত রক্তচাপ নামানো হয়। দু দলকেই একই পরিমাণ রক্ত দেওয়া হয় এবং একদলকে

আকুপাংচারের সুনির্দিষ্ট বিন্দুতে উত্তেজনা দেওয়া হয়, খুঁটিনাটি বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে সংক্ষেপে বলা যায়, যাদের সঙ্গে আকুপাংচার করা হয়েছিল, তাদের ক্ষেত্রে রক্তচাপ অনেক কম সময়ে, কম পরিমাণ রক্ত দিয়েই স্বাভাবিক হয়েছিল এবং মৃত্যু কারোরই ঘটে নি। খরগোসের কয়েকটি অনুরূপ বিন্দুতে আকুপাংচার করে দেখা গেল, তার পেইন থ্রেশোল্ড উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, ন্যালোক্সোন ইনজেকশন করে তা প্রায় বিলুপ্ত হয় (অর্থাৎ এন্ডোর্ফিন-এর ভূমিকা থাকে) এবং অন্য খরগোসের আকুপাংচার না করে, তার ও পূর্বোক্ত খরগোসের রক্তসংযোগ ঘটিয়ে দেখা গেল সেটিরও ফের থ্রেশোল্ড বেড়েছে। জীবজন্তুর মধ্যে করা এই ধরনের অজস্র পরীক্ষা বহুবার করে মোটামুটি একই ধরনের ফল পাওয়া গেছে। এদের ক্ষেত্রেও প্ল্যাসিবো ভূমিকা থাকার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ আকুপাংচারে (এবং অনুরূপ উত্তেজনাতেও) শরীরে জৈবরাসায়নিক নানা পদার্থের ক্ষরণ, বৃদ্ধি ইত্যাদির ভূমিকা আছে। এখনো পর্যন্ত জানা এসবের তালিকায় আছে এন্ডোর্ফিন, এনকেফালিন, সেরোটনিন বা ৫-এইচ টি, গাবা, প্রাটাগ্ল্যানডিন, সোমাটোট্যাটিন ইত্যাদি। আকুপাংচারের বিশেষ কিছুতে উত্তেজনা দিয়ে এফ-এমআরআই-তে মস্তিষ্কের বিশেষ স্থানের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।

এছাড়া থাকে নার্ভতন্ত্রের ভূমিকা। ব্যথাবিশেষজ্ঞ মেলজাক-ওয়াল আকুপাংচারের সাহায্যে ব্যথা কমানোর ক্ষেত্রে গেটকন্ট্রোল মেকানিজম, স্পাইন্যাল কর্ডের সেগমেন্টাল যোগাযোগ, এসবের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া আছে ব্যথা কমানোর জন্য শরীরের নিজস্ব ইনহিবিটরি ডিসেন্ডিং নার্ভ ফাইবারের ভূমিকা, যা আকুপাংচারের সাহায্যে বেশি মাত্রায় সক্রিয় হয়। প্রায় রিফ্লেক্স প্রতিক্রিয়ার মতো সেগমেন্টাল যোগাযোগে কীভাবে অনেক ক্ষেত্রে হাতে পায়ের কিছু দূরবর্তী অংশে কাজ করে, তা একটি স্তর পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে। হাঁটুর নীচে একটি বিন্দুতে উত্তেজনা দিলে সেটি পাকস্থালীর অস্বাভাবিকত্ব ঠিক করে বলে বলা হয়। সুস্থ মানুষ ও জীবজন্তুকে পেন্টাগ্যাসটিন ইনজেকশন করে কৃত্রিমভাবে পাকস্থলীর ক্ষরণ ও সঞ্চালন বাড়িয়ে তারপর ঐ বিন্দুতে আকুপাংচার করে, ইলেকট্রোগ্যাস্ট্রোগ্রাম-এর মাধ্যমে দেখা গেছে, তা কমেছে। কিন্তু সুস্থ পাকস্থলীতে তা কোনো ভূমিকা রাখে না।

কয়েক হাজার বছর আগেকার বর্ণনামতো মেরিডিয়ান ইত্যাদি না খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় যে সব আকুপাংচার বিন্দুর উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে তার শতকরা ৭০-৭৫ ভাগই ট্রিগার পয়েন্ট, মটর পয়েন্ট, টেন্ডার পয়েন্ট ইত্যাদির সঙ্গে মেলে। বেশি বিস্তারিত উল্লেখের মধ্যে না গিয়ে সংক্ষেপে এটি উল্লেখ করা যায়, আকুপাংচারের উত্তেজনা (তা অন্যভাবেও দেওয়া যায়; আকুপাংচার সুবিধাজনক বলে তা করা যেতে পারে), মূলত কাজ করে প্রাণীর নার্ভতন্ত্র, এন্ডোক্রিন ও ইমিউন ব্যবস্থার (এনইআই) জটিল সমন্বয়ে তাদের প্রভাবিত ও উন্নত করে। হেমিওপ্যাথি ওষুধে কোনো কার্যকর অণু (বা তাঁদের ভাষায় বিশেষ কম্পন) খুঁজে না পাওয়া গেলেও, আকুপাংচারের ক্ষেত্রে তার উত্তেজনাই তার বাস্তব বা অবজেকটিভ দিক, যেটি শরীরে নানা জৈবরাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে কাজ করে। এসব কারণে আমাদের ছাত্রাবস্থায় যা থাকত না, মেডিক্যাল (এমবিবিএস) পাঠ্যপুস্তকের এখনকার সংস্করণে বিগত কয়েক বছর ধরেই আকুপাংচারেরও কিছু কিছু উল্লেখ থাকা শুরু হয়েছে, যেমন হ্যারিসন বা ডেভিডসনের মেডিসিন, স্যানং-এর ফিজিওলজি, পেইন (ব্যথা)-র উপর বইপত্র। পাশাপাশি এখনো কিছু কিছু আকুপাংচার চিকিৎসক আছেন, যাঁরা শুধুই প্রাচীন তত্ত্বকে অনুসরণ করেন। কিন্তু সার্বিকভাবে তার পরিমার্জনা ও আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্তির প্রক্রিয়া ক্রমশ বাড়ছে এবং তা আরো দীর্ঘদিন চলবেও। এবার চীনে যার বিস্তারিত উদাহরণ দেখার সুযোগ হল।

বর্তমান স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও গবেষণা মূলত মুনাফা ও তার উপযোগী মানসিকতা নির্ভর। একটি নতুন ওষুধ বা যন্ত্র (পণ্য) আবিষ্কার করে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করার জন্য বিপুল অর্থব্যয়ে ও উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো হচ্ছে। এবং সার্বিকভাবে বিজ্ঞানের নামে এমন ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে যে, ঐ সব গবেষণাগারের ছাড়পত্র না পাওয়া অন্য সব কিছু অবৈজ্ঞানিক বা ভদ্রভাষায় প্ল্যাসিবো। অথচ এই গবেষণারও সীমাবদ্ধতা আছে। প্রচুর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গবেষণার ছাড়পত্র পাওয়া ওষুধ দু-এক দশক পরেই দেখা গেল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য বাতিল করতে হল। অন্যদিকে এমন মানসিকতাকেও প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে যে, পণ্যবিহীন তথা ওষুধ-যন্ত্রপাতি ছাড়া বিপুল ব্যবসার সুযোগ না থাকা কোনো পদ্ধতি ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নয়। এমন ভাবনা বহু তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির মধ্যেও রয়েছে, যাঁরা যান্ত্রিকভাবে বস্তুবাদের কথা বলেন। আর এইভাবেই এঁরা ভুলে যান যে, আমাদের শরীরেই রয়েছে বিপুল 'ওষুধ' কারখানা (এন্ডোফার্মাকোলজি) ও নিজস্ব চিকিৎসা ব্যবস্থা। শরীর তার নিজস্ব ক্ষমতায় একটি স্তর পর্যন্ত রোগনিরাময়ের চেষ্টা করে, তা সে জীবাণু সংক্রমণহ হোক বা হৃদরোগ। পণ্যনির্ভর

চিকিৎসা ব্যবস্থায় এই ক্ষমতাকে উপেক্ষা করে (যেমন প্রায়শ ঘটে অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে), এমনকি অবদমিত করে (যেমন হয় স্টেরয়েডে) চিকিৎসাকে বিজ্ঞানসম্মত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিশেষ সীমিত কিছু ক্ষেত্রে তার অবশ্যই প্রয়োজন থাকে। কিন্তু যখন সেটিই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, তখন তার মধ্যে মুনাফাকেন্দ্রিক দর্শনেরই প্রতিফলন ঘটে। অথচ আদর্শ চিকিৎসাব্যবস্থা তাই হওয়া উচিত (এবং হয়ত কয়েক দশক পরে তাই হবেও), যেটিতে শরীরের রাসয়নিক দূষণ না ঘটিয়ে, শরীরের নিজস্ব রোগনিরাময়কারী ক্ষমতাকে উন্নত করেই মূলত চিকিৎসা হবে এবং তা হবে আধুনিক বিজ্ঞানের পদ্ধতির সাহায্য নিয়েই (যেমন ইতিমধ্যেই হয়েছে টিকা-র মাধ্যমে)। আকুপাংচারের মতো প্রকৃতিবান্ধব, রাসায়নিক দূষণমুক্ত কিছু প্রাচীন বা অর্বাচীন ব্যবস্থায় শরীরের এই ক্ষমতাকেই কাজে লাগানো হয় ও উন্নত করা হয়। এ ক্ষেত্রে ঐ প্রাচীন ব্যাখ্যা অনুযায়ী ছি, মেরিডিয়ান, ইন-ইয়াং জাতীয় পরিভাষা অপ্রাসঙ্গিক। বহু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই ধরনের পদ্ধতির মূল এই ভাবনাই আগামীকালের আদর্শ চিকিৎসা ব্যবস্থা হবে। তখন ঐ সূঁচ ফোটানো বা তথাকথিত আকুপাংচার ব্যাপারটাই হয়ত থাকবে না। আরো কোনো উপযুক্ত উপায়ে তা করা যাবে। কিন্তু আকুপাংচারের প্রমাণিত এই কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে না জেনে বা তাকে সচেতনভাবে উপেক্ষা করে, এই ধরনের নানা পদ্ধতিকে হতমান ও অবদমন করার মধ্যে মুক্তমনের জনমুখী বিজ্ঞানচিন্তার চেয়ে বিজ্ঞানের আড়ালে পণ্যমুখী দর্শন বেশি প্রকট হয়। আধুনিক চিকিৎসার বহু জীবনদায়ী ও অন্যান্য পদ্ধতি এখন অপরিহার্য হলেও, এটিও সত্য যে, যদি আকুপাংচার (বা এই জাতীয় চিকিৎসা, যেমন কিছু ব্যায়াম, খাদ্য, প্রাকৃতিক কিছু নিয়ম অনুসরণ ইত্যাদি) সার্বিকভাবে ও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয় তবে বিশেষ কিছু ওষুধের (যেমন ব্যথার ওষুধ, অ্যালার্জির ওষুধসহ অ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য অনেক কিছুরও) কোটি কোটি টাকার ব্যবসা কমে যাবে, যা আংশিকভাবে এখন ঘটছেও। এ কারণে আন্তর্জাতিকভাবেই চিকিৎসা ব্যবসায়ীমহল নানাভাবে পাল্লা ভারী রাখে নিজেদের দিকেই। চিকিৎসা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার অভিমুখ কোনদিকে হবে তা ঠিক করে তারাই বা বলা ভাল ঠিক করার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোর এখনো তাদেরই বেশি।

এরই অন্যতম আরেকটি প্রতিফলন ঘটে, আকুপাংচারকে (ও এ জাতীয় অন্য কিছু চিকিৎসাকে) বিকল্প চিকিৎসা হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার মধ্যে, অর্থাৎ তা যেন আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিকল্প এবং আধুনিক পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাই আসল চিকিৎসা। কিন্তু কোনো রোগের চিকিৎসা প্রকৃতপক্ষে এইভাবে বিকল্প বা নির্বিকল্প হতে পারে না। চিকিৎসার মধ্যে নানাদিকই থাকতে পারে। যেমন হাঁটুর ব্যথা (অস্টিওআর্থোসিস) শুরুতেই আকুপাংচার, ব্যায়াম, কিছু সতর্কতা, বড় জোর বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দিয়ে চিকিৎসা করাটাই আদর্শ, তার ফলে বিশেষজ্ঞদের দেওয়া ব্যথার ওষুধ তথাকথিত কার্টিলেজ পুনর্গঠনের (?) দামি ওষুধ ইত্যাদি ও ভবিষ্যতে অস্ত্রোপচার প্রায় সব ক্ষেত্রেই পরিহার করা সম্ভব। রোগের শুরুতে চিকিৎসা শুরু করা অসংখ্য আকুপাংচার রোগীদের ক্ষেত্রে তা সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এখনো তা সার্বিক তো নয়ই, অতি ক্ষুদ্র অংশ। ফলে 'গবেষণা'লব্ধ ফল অনুযায়ী, আসলে সন্দেহজনক কার্যকারিতার কার্টিলেজের ওষুধ সহ নানা ওষুধের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান এবং একইসঙ্গে ক্রবর্ধমান হাঁটু প্রতিস্থাপনের অস্ত্রোপচারও। অন্যান্য বহু রোগের ক্ষেত্রেই তা সাধ্য। অন্যদিকে যক্ষা বা জীবাণু সংক্রমণজনিত মেনিঞ্জাইটিস-এনসেফালাইটিসের জন্য শুরুতে অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদির চিকিৎসাই কাম্য। কিন্তু তারপরে রোগের ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হওয়া পক্ষাঘাত বা অন্যকিছুর জন্য আকুপাংচার ও ব্যায়ামই উপকার দিতে পারে। এই ধরনের বহু উদাহরণই দেওয়া যায়।

যাই হোক, এ বিষয়ে আলোচনা আরো সুদীর্ঘ না করাটাই শ্রেয়। শুধু সবশেষে এটুকু বলার, বিজ্ঞানে আপাতত প্রমাণিত তথ্যকে সত্য হিসেবে ধরা হলেও, বিজ্ঞানে সেটিই শেষ কথা নয় এবং প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্ক মুক্তমনের মানুষ জানেন, এখনো আমাদের অনেক কিছু জানা নেই, আমাদের শরীর, তার নানাবিধ রোগ আর তাদের চিকিৎসা সম্পর্কে ব্যবহারিকভাবে তা আরো বেশি সত্যি।

বিনীত

ভবানীপ্রসাদ সাহু

দ্রঃ গত অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ সংখ্যায় সুব্রত ঘোষের লেখা 'বিশ্বাসে মিলায়' লেখাটির প্রথম পরিচ্ছদটি, মানে 'দেহের ওপর মনের... থেকে কৃষ্ণপ্রাপ্তি বা আরোগ্যলাভ।' সম্পাদকীয় সংযোজন। এটি সাধারণত বোল্ড টাইপে দিয়ে মূল লেখা থেকে আলাদা করা হয়। এ ক্ষেত্রে অনবধানে তা করা হয় নি। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক

উমা

পূর্ব কলকাতার জলাভূমির ইতিকথা

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ধ্রুবা দাশগুপ্ত**

দ্বিতীয় অংশ

প্র: আপনি যে এই এলাকায় ছোট থেকে বড় হয়েছেন, শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন, এই পুরো সময়টার আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল?

উ : আর্থ-সামাজিক অবস্থা আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে। মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার দিকটাতেও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। মাছচাষও সেই আগের অবস্থায় নেই। আরও উন্নতভাবে মাছচাষ হচ্ছে। আগে যেভাবে মাছচাষ হত, এখন সেভাবে হয় না।

জমিদারি আমলে তারা মাছগুলোকে বড় বড় করে বিক্রি করত। শ্রমিকদের না দিলে নয় এইরকম ব্যাপার ছিল না। মালিক মাছ ফেলত বছরে দুবার কি তিনবার। ফেলত প্রয়োজন অনুযায়ী। সেই মাছ দেড়-দু কেজি হলে তারপরে তারা বাজারে বিক্রি করত। শ্রমিকদের দিয়ে ধরাত, তারপর সেই মাছ বাজারে পাঠাত। এখন কিন্তু সেইভাবে মাছচাষ হয় না। এখন এরিয়া অনুযায়ী কতটা মাছ ফেলা দরকার, সেই মাছটা কতটা পরিমাণ ফেলা হয়েছে, তার রেশিও অনুযায়ী যে বেড়েছে, এই বাড়ার অনুযায়ী কতটা মাছ হতে পারে, তার পরিমাণ কত এবং সেই মাছ কতটা ধরা হল এই সময়কালের মধ্যে, সবসময় সেটার হিসেব থাকে। যারা মাছচাষের সঙ্গে যুক্ত বা ভেড়িগুলো যারা চালাচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই এদের মাথায় আছে যে জেলেরা, যারা ধরে মাছটা, তারা জাল ফেললে বুঝতে পারে ভেড়িতে কীরকম মাছ আছে, মাছ ফেলার প্রয়োজন আছে কিনা, আর মাছ ফেলতে গেলে এখন কী পরিমাণ মাছ ফেলতে হবে। সাধারণত জেলেদের এই অভিজ্ঞতা হয়ে যায় মাছ ধরতে ধরতে। ফলে, সারা বছরই প্রত্যেক দিন মাছ ধরা হচ্ছে, মাছ ফেলাও হচ্ছে, তৈরি করাও হচ্ছে। আগে বাইরে থেকে ধানী মাছ, চারা মাছ আসত, মালিকেরা মাছ ফেলত। এখন কিন্তু নিজেরা ও চাষীরা মাছচাষ করে। যে সমস্ত ঝিল-পুকুরগুলি আছে, সেই ঝিল-পুকুরে তারা শুকনো করে মহুয়া দিয়ে চেঁছে মুছে পরিষ্কার করে, মাটিটা চষে, মাছের খাদ্যের উপযুক্ত হবে এরকম এক পাতা বা দু পাতা জল এসে যায়। জল তুলে জলটা যখন মাছ ফেলার উপযুক্ত হবে সেই সময় ডিম বলি আমরা— আঁতুর পুকুরে (আঁতুর পুকুর করতে গেলে যা যা করতে হয় সেগুলো করে) রাখা হয়, রেখে সেটা ২১-২২ দিন পরে দেখা যায় সেগুলো বেশ ছুটে বেড়াচ্ছে, ডিম দিয়ে ছাঁকলে বোঝা যায় সেগুলো বেশ ছিটকে বেরিয়ে পড়ছে, নিজেরা চলতে পারছে, এইরকম অবস্থায় তাদেরকে আবার একটা— সেটাকেও আঁতুর পুকুরই বলা যায়, কিন্তু সেটা অতটা ছোট আকার নয়, তার চেয়ে একটু বড় হলে, ২৫ দিনের বাচ্চা হলে সেখানে দেওয়া হয়। সেখানে দেবার পরে সেখানে ১০-১৫ হাজার গুনতিতে হলে সেইখান থেকে আবার একটু বড় জায়গায় দেওয়া হয়। সেখানে গিয়ে যখন দেখা যায় ৬০-৭০টা গুনতি চলে এসেছে, ১ কেজিতে ৬০-৭০টা মাছ হচ্ছে, তখন আবার সেগুলোকে নিয়ে বড় খোলে দেওয়া হয়। তারা, বড় মাছ যেটা প্রত্যেক দিন ধরা হচ্ছে সেই মাছের সঙ্গে তাদের খাওয়া সারে এবং মাছ ধরতে গেলে তারা যে ছুটে বেরিয়ে যায়, সেই সামর্থ্য হলে বড় খোলে দেওয়া হয়। আর যদি তার চেয়ে ছোট হয় তাহলে তাদের ক্ষতি হয়, তারা খেতে পায় না, বড় মাছের সঙ্গে তারা পেরে ওঠে না, ফলে মারা যায় তারা।

প্র : ময়লা জলের যে পুষ্টিগুণ, সেটা তো আগের থেকে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও মাছ ছাড়ার এবং পালন করার পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে?

উ : যত সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে, তত কিন্তু মাছচাষেরও পরিবর্তন হচ্ছে। এটার বাইরে যাওয়া যাচ্ছে না, সবাই এটা বলে। আমার সঙ্গে যারা কাজ করেছে, তারা মরে গেছে অনেকে, এখন আছে দু-চারজন, তারা বলত যে, আগে এই খাল দিয়ে যে জল আসত সেই জলে তপসিয়ার যে বর্জ্য সেটা কিন্তু থাকত না। খাটালের গোবর ধোয়া জল— বেশির ভাগ খাটালগুলো ছিল খালপাড় দিয়ে, শহরের খাটালের গোবর ধোয়া জল। সেগুলো ভেড়িতে ঢোকার পরে মাছের খাবার আগ্রহ থাকত অনেক বেশি। এখন ময়লা জলে মাছ কিন্তু তেমন আর মুখ করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ময়লা জল

ঢুকে শ্যাওলায় না পরিণত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাছ আর খেতে পারে না। ওই ময়লা জলের মধ্যে গেলে মাছ এখন মরে যায়। আগে ময়লা জলে মাছ দূরে চলে গেলে ফিরে আসার ক্ষমতা ছিল, সে মরত না। কিন্তু এখন ময়লা জলে দূষিত অংশটা বেশি হওয়ার ফলে সেটা আর হয় না। আবার কেউ কেউ বলে, আগে বাড়িতে ধোয়া-পরিষ্কার করা, জামাকাপড় কাচা ইত্যাদির জন্য যেসব সাবান যে সব ব্যবহার হত, সেগুলো হত ক্ষার জাতীয়। এখন ডিটারজেন্ট ব্যবহার হচ্ছে। সেগুলোই জলের সঙ্গে মিশছে; এই জলে মাছের বেঁচে থাকাটাও একটা পরিপন্থী হচ্ছে। এরকম কিছু কথা শোনা যায়।

প্র : আর্থ-সামাজিক কথায় ফিরে আসি। ধরুন আপনার ধাপা মানপুর এলাকা। এখানে বিদ্যুৎ কবে এল? এটা কি আপনারা না চাইতেই পেয়ে যান, না তার জন্য কিছু পরিশ্রম করতে হয়?

উ: চিংড়িঘাটা পর্যন্ত বিদ্যুৎ অনেক আগে এসেছে। বাইপাসের এপারে বিদ্যুৎ এসেছে ১৯৯০-৯৫ সালের দিকে। আমাদের এখানে (খাসমহলে) এসেছে ২০০০ সালের অনেক পরে। এমনিতে আসে নি। এর জন্য অনেক আন্দোলন করতে হয়েছে, সাধারণ মানুষকে ছোটাছুটি দৌড়োদৌড়ি করতে হয়েছে। অনেক কষ্ট করেই সরকারকে বাধ্য করাতে হয়েছে যে, এখানে আমাদের বিদ্যুতের প্রয়োজন, বিদ্যুৎ দিতে হবে।

প্র : ভোট বয়কট করতে হয়েছে?

উ : হ্যাঁ, ভোট বয়কট হল, নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করতে হয়েছে, আন্দোলন করতে হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়— জেলা সভাধিপতি থেকে বিদ্যুৎ দপ্তর ও বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি করতে হয়েছে। ফলে একটা চাপে পড়েছিল, দেখল যে সত্যি এদের বিদ্যুৎ না দিলে নয়। তখন অশোক ভট্টাচার্য নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন, বললেন ঠিক আছে বিদ্যুতের ৭৫ হাজার টাকা আমি আমার দপ্তর থেকে করে দেব। ১৯৯৫ সালে বিদ্যুৎ আসে ওভাঙ্গার ওদিকে। ভগবানপুরের এইদিকে বিদ্যুৎ আসে ২০০০ সালের পর। খাসমহলের দিকে ২০০০ সালেরও পরে।

প্র : এবার আসি স্কুলের কথায়।

উ : এখানে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ১৯৬২ সালে। ১৯৮২ সালে এসে বন্ধ হয়ে গেল। আর কোনও শিক্ষক ছিল না। সেটা পড়ে রইল, গরুর গোয়াল হয়ে গিয়েছিল। ১৯৯০ সালের পরে আন্দোলন করে, চাপ দিয়ে, সেটাও ওই ভোট বয়কট। নেতারা তাড়া খেল, মার খেল। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত একজন শিক্ষককে রাখতে হয়েছে, কিন্তু সে স্কুলে আসত না। অন্যত্র মাস্টারি করত, এখানে স্কুলের নামে টাকা তুলত। তারপর বলা হল স্কুলটা লিভিং আছে, তখন প্রথম একজন শিক্ষক দিল, তার ছ মাস পরে আর একজন শিক্ষক দিল, সেই থেকে স্কুলটা চালু হল। স্কুলটার নাম ছিল চকের ভেড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

প্র : উঃ ২৪ পরগনার দিকে পূর্ব কলকাতার জলাভূমির যে মৌজাগুলি আছে, সেখানে এইরকম স্কুলের সংখ্যা তো এখনও বেশি নয়?

উ : জলাভূমির এলাকায় স্কুল তিনটে। সুকান্তনগরকে যদি বাদ দেন, তাহলে তিনটে স্কুল আছে— নাওভাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছয়নাভি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চকের ভেড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়। হাই স্কুল এখানে নেই— ওদিকে কেষ্টপুরে।

প্র : রাস্তা?

উ : এখানে রাস্তা কি রকমভাঙাচোরা অবস্থায় আছে, তা আপনি নিজেই দেখেছেন। এখানে তো কোনো রাস্তাই ছিল না! রাস্তাটা হয়েছে পৌরসভা হবার পরে। ১৯৯৫ থেকে পৌরসভা - বিধাননগর পৌরসভা, তারপর রাস্তাটা হল।

প্র : তাহলে এই যে পরিষেবা এল, তা তো রাজনৈতিক পটভূমিকা পরিবর্তন হবার পর। যখন ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট প্রথম ক্ষমতায় এল, তখন স্লোগান ছিল 'জমি দখল করো, চাষ করো'।

উ : সিপিআই আর সিপিআই (এম) তখন আলাদা ছিল। তখন স্লোগানই ছিল 'খাস জমি দখল করবে, চাষ করবে', 'জোতদারের গোলা হাটাও, ফসল দখল করো', 'মজুর ফসল দখল করো', 'লাঙ্গল যার, জমি তার'। এই স্লোগানগুলো মানুষের ভেতরে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মানুষ এটা ভাবত যে, এই জমিদাররা যেভাবে অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ, শাসন করত, তার একটা বদলা আমরা নেব। সুযোগ পেলেই নেব। চাষের ক্ষেত্রে যেসব জমিদার হাজার বিঘের মালিক বা ৫০০/২০০/৪০০ বিঘের মালিক ছিল, তারাও তো শাসন শোষণ করত, ক্ষেতমজুরদের নিয়ে খাটাত, তারাও শোষণ করত। ১৯৬৭ সালে জোতদাররা সত্যিই চাপে পড়েছিল। মজুররা তাদের বলছে, আমাদের সময় বেঁধে দিতে হবে— সকাল ৭টায় যাব, ১২টায় ছেড়ে দিতে হবে। আবার ২টোয় যাব, ৫টায় ছেড়ে দিতে হবে। ভোর হওয়ার আগে যাব, আর রাত্রি ৯টা অবধি কাজ করব, তা হবে না। চাষের ক্ষেত্রে এগুলো ঘটেছে। বড় বড় এলাকা, যেমন হাড়োয়া ইত্যাদিতে জমিদাররা পালাতে বাধ্য হয়েছিল। চাষীরা দখল নিয়েছে। এখানে

ভেড়ি অঞ্চলে ভেড়ি দখল হবে বললেই চারিদিকে লোকজন সব এসে জড়ো হত। মালিকেরা দেখত এই বিশাল জনগণ, পুলিশ দিয়েও কিছু হবে না। পুলিশ তখন যুক্তফ্রন্টের পক্ষে ছিল। হরেকৃষ্ণ কোঙারদের পক্ষে ছিল। জমিদাররা পুলিশ দিয়ে চাষীদের তাড়াত বা মারত না। ফলে ভেড়িগুলো লুটপাট, দখল হয়ে পড়েছিল। একটা জিনিস ভেঙে গেলে সেটাকে তৈরি করতে আবার সময় লাগে। মালিকেরা দেখল, ভেড়িগুলো লুটপাট হয়ে গিয়েছে সব— মাছ নেই, আলাঘর সব ভেঙে দিয়েছে, আবার নতুন করে সব তৈরি করতে হবে। ভেড়িগুলোতে পানা জমে রয়েছে, সে সব পানা তুলতে হবে, তবে তো মাছ চাষ হবে! চাষীরা আবার কী করবে তার ঠিক নেই। তাদের ভেতরে একটা ভয় এসে গেল। তারা ইচ্ছে থাকলেও সাহসে কম হয়ে গেল— পারব তো করতে? সে সময় এক বিশাল নকশাল আন্দোলনও হয়েছিল— রাজ্যময়, দেশময়। সেই সময়টা এইসব ভেড়ি অঞ্চলেও দুর্ভোগ গিয়েছে শ্রমিকদের। তারপরে দেখা গিয়েছে যে আবার একটা যুক্তফ্রন্ট হয়েছিল।

সেটাও বোধহয় ১১ মাস না ৩৩ মাস ছিল। সে সময় মালিকেরা কেউ কেউ ভেড়ির ধারে এসেছে, করবার চেষ্টা করেছে। ১৯৭২ সালে যখন বাংলাদেশ যুদ্ধ হয়ে গেল, তখন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আসবার পর মালিকেরা বুঝে গেল যে, এবার আমরা পারব। তখন মালিকেরা এসে আবার ভেড়িগুলো করতে শুরু করল। সেভাবে পুলিশ ওদের সাহায্যও করত। শ্রমিকদের মধ্যে ভাবনাটা এইরকম এল যে, দখল তো আমরা করলাম, তরপর পানা বন হয়ে পড়ে রইল, না খেয়ে মরলাম। যাক গে, মালিক যখন বলছে, আমরা শ্রমিকই হয়ে থাকব, মালিক করুক। ১৯৭২-৭৭ পর্যন্ত ভেড়িগুলো আবার মালিকেরা করতে শুরু করল। আর শ্রমিক শ্রমিক হয়ে কাজ করতে শুরু করল। কিন্তু তার মধ্যে ভেড়ি সংগঠনগুলো গড়তে শুরু করল (বামফ্রন্টের)। সংগঠনগুলো হওয়ার পরে শ্রমিকেরা তাদের মজুরি ও অন্যান্য দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করল— আমরা সকালে আসব আর ৫টা পর্যন্ত কাজ করব, এটা আমরা পারছি না। আমাদের করার ক্ষমতা নেই। আমাদের সমস্ত হাত-পা হাজা লেগে ক্ষয়ে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শরীরের কিছু থাকে না— **আমরা ৪ ঘণ্টার বেশি জলে কাজ করব না**। সিপিএম নেতারা আন্দোলন শুরু করল শ্রমিকদের নিয়ে। মজুরিবৃদ্ধির আন্দোলন, অন্যান্য আন্দোলন যেমন, বিড়ি-দেশলাই, মালিকদের বলল এটা তোমাদের দিতে হবে, শ্রমিকরা তোমাদের কাজ করে দেবে। টর্চলাইট দিতে হবে ভেড়ির বাঁধে চলার জন্য। মালিকেরা এই সব কিছু কিছু দাবি মেনে নিল। দেখল ঝামেলায় দরকার নেই, ওদের নিয়েই করতে হবে, যে দাবিগুলো করছে, সেই মতো চলি। এইভাবে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ভেড়িগুলো মেটামুটি চালু হল। এগুলো খুব সহজে এসেছে তা নয়। কিছু কিছু মালিক যেমন সমীর সরকার— যারা এইসব আন্দোলনের নেতা হয়েছিল, যেমন— পঙ্কজ মাকাল, রায়ভূষণ মণ্ডল; মালিকের যারা দারোয়ান বা বাহিনী ছিল এদের খুব নিপীড়ন করেছে। নিপীড়ন করার পরেও আন্দোলন, দাবিদাওয়া করে একটা জায়গায় আসা গিয়েছে। ১৯৭৭ সালে যখন বামফ্রন্ট সরকার পুরো মাত্রায় আসল, তখন থেকে মালিকদের ওপর চাপটা আরও বেড়ে গেল। ১৯৭৭-এর পর থেকে প্রত্যেক বছর মজুরিবৃদ্ধি, কাঁথা-কম্বল দিতে হবে, টর্চলাইট দিতে হবে, বিড়ি-দেশলাই দিতে হবে, ছুটি দিতে হবে মাসে অন্তত ২টো— এইসব আন্দোলন শুরু হল। খাবার মাছের আন্দোলন। আমরা মাছ ধরব আর বাড়ি এসে শুধু ভাত খাবে, এমনটা হবে না, আমাদের মাছ দিতে হবে। এইসব দাবিদাওয়া বেশ ভালই জোরদার হল এবং মালিকেরা দেখল যে আমরা বেশ ভাল চাপেই পড়ছি। বামফ্রন্ট মালিকের পক্ষে খুব একটা ছিল না। ততদিনে ভেড়ির শ্রমিকদের ভেতরে একটা নেতৃত্ব তৈরি হল।

প্রত্যেকটা ভেড়ির একটা করে সংগঠন হল। সে সংগঠনে নেতা তৈরি হল। আর সামগ্রিক একটা সংগঠন তৈরি হল যেমন— দক্ষিণ ২৪ পরগনা ভেড়ি মজদুর সংগঠন, উত্তর ২৪ পরগণা ভেড়ি মজদুর সংগঠন। ১৯৭৭ সাল থেকে ৩৪ বছর এই সময়কালে মালিকানা ব্যবস্থাটা প্রায় ভেঙে পড়ল। তার আর একটা কারণ হল যে, এই ভেড়িগুলোতে বেশ কিছু জমি মালিকের নামে ছিল না, খাস ছিল। জবরদস্তি তারা মালিকানায় ছিল। ফলে সরকারের খাজনা না দিলে যাদের নামে আছে, বেশ কিছু বছর ধরে খাজনা যদি না দেওয়া হয় তাহলে খাস হয়ে যাবে, একটা নিয়ম আছে। সেইভাবে সরকারও খাস করে দিল। ফলে খাস জমি হয়ে গেল ভেড়িগুলো। চাষীরা বলল, আমাদের খাস জমি দিতে হবে। মালিকেরা চাপে পড়ে পিছু হটতে শুরু করল। এই চক্রান্তের সময়ই মালিকেরা দেখল যে, একবার যদি বিক্রি করে দিয়ে পালিয়ে যেতে পারি।

প্র : বামফ্রন্ট নেতাদের বিরুদ্ধেও শ্রমিকদের আন্দোলন করতে হয়েছে। শ্রমিকদের কথা ভেবে যারা ক্ষমতায় আসে,

তাদের থেকেও রীতিমতো আন্দোলন করে শিক্ষা এবং পরিকাঠামোর (বিদ্যুৎ, রাস্তা) সুবিধা আদায় করতে হয়েছে। স্বাস্থ্যটা তা সত্ত্বেও হয় নি। ১৯৬৭ সালে আপনি কৈশোরে আর ১৯৭৭-এ যৌবনে। আপনাদের প্রজন্ম যে আন্দোলনের প্রতি একটা অংশীদারিত্ব বোধ ছিল, তার ফলে লাভ কোথায় হয়েছে আর ক্ষতি কোথায় হয়েছে?

উ : ১৯৬৭ থেকে ৭২, এই সময়টায় আমি মনে করি একটা পুরো সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজটা দীর্ঘদিন যেভাবে ছিল, স্বাধীনতার আগে বা স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত, সেটা একটা মন্থর গতিতে এগোচ্ছিল। কিন্তু ১৯৬৭ সালের পর থেকে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে, একটা আলোড়ন ঘটে গিয়ে বলা যায়। আলোড়নটা ঘটে যাওয়ায় যে সামাজিক পরিবর্তন এল, ১৯৭২ সাল পর্যন্ত একটা স্থিতাবস্থা তৈরি হয় নি। শুধু ভাঙা-গড়া হয়েছে। একবার এদিকে, একবার ওদিকে হয়েছে। ১৯৭২ সালের পর থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত স্থিতাবস্থা হলেও একটা চাপ ছিল। কথা বলার অধিকার, চলার অধিকার বা অন্যান্য যে অধিকারগুলো বলার মতো সাহস তখন জনগণের স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল, পারত না সিদ্ধার্থশঙ্করের আমলে। তারপর ১৯৭৭ সালে যখন বামফ্রন্ট এল তখন ভেড়ি অঞ্চলে একটা দ্রুত পরিবর্তন এল। অর্থনৈতিক পরিবর্তন, রাস্তাঘাট, পরিকাঠামোর পরিবর্তন এবং চাষের পরিবর্তন, মানুষের কথা বলার অধিকারের পরিবর্তন, শিক্ষার দিকটাও পরিবর্তন— এইসবগুলো দ্রুত পরিবর্তন হতে শুরু করল ১৯৭৭ সাল থেকে। ১৯৭৭ সালের আগে কথা বলার অধিকার ছিল না, মানুষ ভয়েই ছিল, সংগঠিত হবার সুযোগ পেত না। তারপর ১৯৭৭-এ যখন বামফ্রন্ট এল, ভারতে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হল। ইন্দিরা গান্ধী তথা সেকালের জনতা সরকার এল, তখন থেকে মানুষের অধিকার পাবার লড়াইটা অনেক বেড়ে গেল, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় অনেক দ্রুততার সঙ্গে বেড়ে গেল। ফলে রাস্তাঘাট, জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা— এইসব মৌলিক যে বেঁচে থাকার উপায়গুলো সেগুলো মানুষ করতে শিখল। আর একটা বলা যায় যে, মানুষ জমির যে অধিকারটা পেত না, আগে অনেক ভূমিহীন কৃষক ছিল (অন্যের জমিতে খেটে রোজগার করে সংসার চালাত) ভেড়ি অঞ্চলে এখানকার আদিবাসীদের চাষের অধিকার ছিল না। ১৯৭৭ সাল আসার পর তারা চাষের জমি জায়গা খানিকটা পেয়ে গেল।

প্র : ভেড়ির স্বত্ব?

উ : আমি চকের ভেড়ি, ১নং পাত্রাবাদ, চচ্চড়ে, নলবনের কথা বাদ দিলাম, এরা সরাসরি সরকারের পরিচালনায় ঢুকেছে। কিন্তু বাকি ভেড়িগুলো তো এখনও যায় নি। গভর্নমেন্ট তার থেকে কিছু পাচ্ছে না, শ্রমিক বা মালিকরাই পাচ্ছে।

আপনাকে একটা ভেড়ির কথা বলি— গোপেশ্বর। ওখানে কিন্তু শ্রমিকেরা মালিক হয়েছে একথা তারা বলতে পারে না। মালিকানা ব্যবস্থা ভেঙে গিয়েছে ঠিকই, তারা মাছ ফেলছে, মাছ ধরছে, উৎপাদন হচ্ছে, তার আয়-ব্যয়, দায়-দায়িত্ব সব তাদের— তারাই সব কিছু পাচ্ছে, কিন্তু সরকারিভাবে যে মালিকানা পাট-মালিক হওয়ার যে কাগজ থাকা উচিত সেটা তারা এখনও পায় নি। সিংটাতে যারা চাষ করছে, নিঃসন্দেহে সব স্বত্বই তারা ভোগ করছে। যারা লিজ করছে, তারা লিজ কর পাচ্ছে, লাভ লোকসান সব পাচ্ছে। যারা ওখানে জমি পেয়েছিল শ্রমিক হিসেবে, তাদের সেখানে কিছুই করতে হয় না, বছরে তারা ৪০০০/৫০০০ টাকা করে প্রত্যেক বিঘেতে লিজ পাচ্ছে। যেহেতু তারা ওই ভেড়িতে কাজ করত সেহেতু বামফ্রন্ট যে সেই সময় ভেড়িটা মাছ চাষ তুলে দিয়ে চাষের জন্য জমি বিলি করে দিয়েছিল, সেই চাষ ওরা বেশ কিছু বছর করেছিল, করার পরে আর বেশি কিছু করতে পারে নি, মাছচাষ এখন বেশি সুবিধেজনক এবং লাভজনক বলে মাছচাষ হচ্ছে। যারা পারছে মাছ চাষ করছে ৫/১০/২০ জন মিলে এক একটা দল করে আর যারা জায়গাটা পেয়েছিল তারা সেগুলো লিজ দিয়েছে। তারা বছরে ৫০০০ টাকা করে লিজ পাচ্ছে সরকার তো এখানে কিছু পাচ্ছে না। বামফ্রন্ট জমিটা যাদেরকে ভাগ করে দিয়েছিল তারা লাভটা পাচ্ছে।

প্র : কিন্তু স্বত্ব পাবার ক্ষেত্রে যে একটা জোর তৈরি হয়, এখান থেকে আমাকে কেউ উঠিয়ে দিতে পারবে না, সেটা?

উ : না, সেটা তারা পাচ্ছে না, সেটা তারা করতে পারে নি।

প্র : আপনারা যারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আপনাদের জীবনে যে একটা সুযোগ-সুবিধা হলে আপনাদেরই উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং একটা স্থিতাবস্থা আসবে আপনাদের জীবনে, সেটাই তো কাম্য। সে জায়গাটা তো মজবুত হল না?

উ : এর জন্য দায় হল যে সরকার যখনই এসেছে, তারা তো মানুষের ভোটে এসেছে, এসে তারা যে কথা বলেছে, সেই অনুযায়ী কাজ তারা করে নি। তারা যখন ক্ষমতা

পেয়েছে, তারা সামগ্রিক কথা ভেবেছে, বিশেষ বিশেষ এলাকার কথা তারা চিন্তা করে নি। এই যে বিশেষ এলাকা, ভেড়ি অঞ্চল এখানে শ্রমিকেরা আছে, চারা মাছ চাষ করছে, একটা দখলীকৃত জায়গায় আছে, তাদের দখলটা থাকবে কি থাকবে না, তার ভবিষ্যৎ কী থাকবে, এটা নিয়ে নেতৃত্ব চিন্তা করে নি।

চকের ভেড়ির কথাই যদি বলি, চকের ভেড়ির শ্রমিকদের নিতান্ত নিজস্ব আগ্রহের জন্য, আমার মতো লোক ছিল বলে ওখানে ভেড়িটা ভেস্ট করানো গিয়েছে, আগে তো মালিকানা পার্ট-এ ছিল, ভেস্ট করিয়ে ভেড়িটা আস্তে আস্তে আজকে কো-অপারেটিভ হয়েছে, একটা রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল বলে।

চচ্চড়ের ক্ষেত্রেও শ্রমিকরা দেখল যে এটা মালিকের হাতে চলে যাচ্ছে, তখন নেতারা দেখল যে এদের এইভাবে গড়ে দিতে পারলে (কো-অপারেটিভ হিসাবে) এটা পার্টির পক্ষেও লাভজনক এবং শ্রমিকেরাও এতে লাভবান হবে। আসলে পার্টি নেতৃত্বে যারা, তারা যে নিজস্ব উদ্যোগে বা আগ্রহ করে দিচ্ছে এমনটা নয়, চেষ্টা-চরিত্র, চাপ-আন্দোলন এই সব করার পরে ভেড়িগুলোর এই অবস্থা হল। যদি বামফ্রন্টের সেই সদিচ্ছা থাকত এইসব ভেড়ির মালিকানা পার্ট চেঞ্জ করে কোঅপারেটিভ করে দেওয়া যেত।

ফলে, এই যে এখন ভরাট হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, ধরুন নারকেলতলার ভেতরে ২ কাঠা/৪ কাঠা করে কিনছে, ডোজার আনছে, এনে ভরাট করে পুকুর করছে পাশে। সে মাটিটা তুলে ভরাট করে নিচ্ছে সেখানে পুকুরও হচ্ছে, বাস্তুও হচ্ছে। তাতে জলাটা কমছে। এগুলো যদি বামফ্রন্ট করে দিত, তাহলে এই পরিস্থিতি তৈরি হত না! আজকে আমি কথা বলতে পারছি না, বেরোতেই পারছি না, তার কারণটা কি? এই সরকার যদি শ্রমিকের কথা ভাবত, তাহলে বড় পরেশের মতো ২৫০ কি ৩০০ শ্রমিক, আজ তারা না খেয়ে মরছে, ভেড়িটা লুটপাট হয়ে যাচ্ছে, ধান চাষ হচ্ছে। কিছু মস্তান তারা করে কম্মে খাচ্ছে। চোর তৈরি হচ্ছে। তারা চুরি করে, মাছ বিক্রি করে, মস্তানদের ঘরে দিতে হবে ৫০ শতাংশ আর তারা পাবে ৫০ শতাংশ। এরকম একটা অবস্থা হয়েছে বড় পরেশে আজ। যে শ্রমিকেরা ক্ষমতায় আছে তারা মালিকের হয়েই কাজ করছে আর শ্রমিকদেরকে ধাপ্পা-প্ররোচনা দিয়ে দলে টেনে রেখেছে।

(ক্রমশ)

সিঙ্গুরের পর ভাঙড়

সিঙ্গুরে জমির পরিমাণ ছিল ১০০০ একর, আর ভাঙড়ে জমির পরিমাণটা মাত্র ৪০ বিঘা হলেও চার লক্ষ ভোল্টের তারের যে ১২টা লাইন তিন ফসলী কৃষিজমি ও মাছের ভেড়ির ওপর দিয়ে যাবে, তাতে পাখি, মাছ, জমির ফসল এক কথায় সামগ্রিক পরিবেশের ওপর কী ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলবে, কী ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়ে যাবে, সেটা ভেবে আশপাশের গ্রামগুলির অধিবাসীরা খুবই উদ্বিগ্ন এবং আতঙ্কিত। তাঁরা দলমত নির্বিশেষে তাই গড়ে তুলেছেন 'জমি-জীবিকা-বাস্তুতন্ত্র-পরিবেশ রক্ষা কমিটি'। এই কমিটির নীচে গ্রামবাসীরা (গ্রামগুলি হল খামারআইট, মাছিডাঙ্গা, উড়িয়াপাড়া, টোনা পদ্মপুকুর, বাগানপাড়া, উত্তর স্বরূপনগর, মজলিশপুর, গাজিপুর ইত্যাদি) আজ এতটাই সংগঠিত যে, একডাকে ২০-২৫ হাজার মানুষ জড়ো হয়ে যেতে পারেন; তাঁদের প্রতিবাদী মেজাজ ও ক্ষোভ এতটাই তুঙ্গে যে, প্রশাসনের হঠকারী পদক্ষেপে যে কোনো মুহূর্তে তৈরি হয়ে যেতে পারে আর একটা নন্দীগ্রাম। পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন (এটি একটি কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা) কর্তৃপক্ষ একদিকে গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করছেন যে, তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ এলাকার পরিবেশের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না, অন্যদিকে তাঁরাই আবার নোটিস দিচ্ছেন হাই ভোল্টেজ তারের নীচে কোনো ঘরবাড়ি বানানো যাবে না, মেটাল পোল বা বাঁশ পোঁতা যাবে না। কর্তৃপক্ষের এই দ্বিচারিতায় গ্রামবাসীরা আরও বেশি সংশয়-উদ্বিগ্ন। কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পরিবেশ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই ব্যাপারে তাঁদের মতামত নেবেন। কিন্তু সমস্যা শুধু পরিবেশেরই নয়, ওই ৪০ বিঘার মূল কেন্দ্র থেকে যে ১২টা তারের লাইন বের করে আনা হচ্ছে সেই তারগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য যে উঁচু উঁচু টাওয়ার বসানো হচ্ছে সেগুলির জন্য ২-৩ কাঠা জমি দরকার। এই জমিগুলি একরকম জোর করে জমির মালিকদের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। গ্রামবাসীরা সবসময়ই একটা আতঙ্কের মধ্যে আছেন, কখন কার জমির ওপর এই টাওয়ার বসবে। টাওয়ারগুলো গ্রামবাসীদের কাছে একটা দৈত্যের প্রতীক বলে মনে হচ্ছে, যে দৈত্যের নিঃশ্বাসে তাদের এত দিনের

সুন্দর, সবুজ গ্রামগুলি শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে যাবে। এবার একটু পিছনের দিকে তাকানো যাক।

সময়টা ২০১২-১৩ সাল। পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন থেকে কন্ট্রাক্ট পাওয়া কোম্পানির গ্রিডের মূল কেন্দ্র নির্মাণের জন্য বিঘা চল্লিশেক জমির দরকার। এই কেন্দ্রে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে আসা হবে এবং তারপর নানাদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত ভাঙড়ের কাশীপুর থানার অন্তর্গত পাকা রাস্তার ধারে এই জমিটা তাদের পছন্দ হয়। কথা হচ্ছিল আজিজুল মোল্লার সঙ্গে। তিনি গল্পের মতো বলে যাচ্ছিলেন ঘটনাগুলো। কোম্পানি অঙ্কের মতো হিসেব করে এগোয়। তারা এলাকার শাসকদলের নেতা আরাবুলের সাহায্য নেয়। ওই ৪০ বিঘা জমির মধ্যে সবচেয়ে বেশি জমি ৯ বিঘার মালিককে খুন করার ভয় দেখিয়ে জোর করে বাজার দরের অর্ধেক (বিঘা প্রতি আড়াই লাখ) দামে কোম্পানিকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য করে আরিবুল। বাকি জমির মালিকদের (যাঁদের জমির পরিমাণ ছিল অল্প) থেকে জমি নিতে তাদের বেগ পেতে হয় নি। প্রথম প্রথম গ্রামবাসীরা বিষয়টার প্রতি খুব একটা গুরুত্ব দেয় নি। কিন্তু তাঁদের টনক নড়ল যখন বিশাল বিশাল ট্রাক্টরে (গ্রামবাসীদের ভাষায় এক -একটা গাড়ির চাকার সংখ্যা ছিল শতাধিক) করে গ্রিডের জিনিসপত্র, ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি জমা হতে লাগল। গ্রামবাসীরা শঙ্কিত হয়ে গ্রামে গ্রামে সভা করে নিজেদের সংগঠিত করতে শুরু করলেন। গ্রিডের কর্মীরা টাওয়ার পুঁততে এলে গ্রামবাসীদের বাধার সম্মুখীন হতে হল। এরপর শুরু হল পুলিশি সন্ত্রাস। আরাবুলকে সঙ্গে নিয়ে গ্রিড কেন্দ্র সংলগ্ন গ্রামে বিরাট পুলিশ বাহিনী এসে নিরপরাধ ৬জন গ্রামবাসীকে ধরে নিয়ে গেল এবং জামিন অযোগ্য ধারায় তাঁদের বিরুদ্ধে কেস দিল। ১৮ দিন তাঁরা জেলে আটক ছিলেন। গ্রামবাসীদের মতে, এই গ্রেপ্তারের পেছনে মূল কারণ গ্রামে ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই প্রসঙ্গে একজন গ্রামবাসী জানালেন, থানার মেজবাবু হাতে বোমা নিয়ে অ্যাকশনে নেমেছিলেন এবং সেই ছবি গ্রামবাসী তাঁর মোবাইল ক্যামেরায় তুলে রেখেছেন। এটা ভাঙড়েই সম্ভব। স্বাভাবিকভাবেই শাসকদল পুরো ব্যাপারটা থেকে হাত ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েতগুলো যেহেতু তৃণমূলের হাতে তাই তারা এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়। কিন্তু গ্রামবাসীরা নিষ্ক্রিয় থাকলেন না। তাঁরা ভেতরে ভেতরে আশেপাশের গ্রামগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং গড়ে তুললেন প্রতিরোধের প্রস্তুতি। কয়েক হাজার গ্রামবাসী একদিন নির্মীয়মাণ গ্রিড কেন্দ্রের সামনে জমায়েত হলেন। এগিয়ে এল পুলিশ। তারা জানাল এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে, কোনো জমায়েত চলবে না। তখন তাঁরা রাজারহাটের দিকে গিয়ে জমায়েত হন। ওদিক থেকে রাজারহাটের পুলিশ তাঁদের ওপর চড়াও হয়। বাধ্য হয়ে জমায়েতের উদ্যোক্তারা সেদিনকার মতো জমায়েত ভেঙে দেন। ইতিমধ্যে তাঁরা তৈরি করলেন 'জমি-জীবিকা-বাস্তুতন্ত্র-পরিবেশ রক্ষা কমিটি'। দলমতনির্বিশেষে গ্রামবাসীরা এই কমিটিতে এসে জড়ো হলেন। কমিটির উদ্যোগে প্রচারপত্র তৈরি হল। ডিএম, এসডিও, বিডিও থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্তৃপক্ষকে ডেপুটেশন দিলেন তাঁরা। অন্যান্য জায়গার প্রতিবাদী মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুললেন। তাঁরা বুঝেছেন, তাঁদের এই লড়াইয়ে শহরের প্রতিবাদী মানুষের সমর্থন ভীষণভাবে দরকার। গ্রামবাসীদের প্রতিবাদী চেহারা দেখে পুলিশ আর আরাবুল বাহিনী এখন কিছুটা সংযত। গ্রামবাসীরা এখন এতটাই সংগঠিত যে গত ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬ প্রায় ৪০ হাজার গ্রামবাসী কলকাতায় জমায়েত হয়ে রাজ্যপালকে ডেপুটেশন দিয়ে এলেন। ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ সন্ধাবেলা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়, কামারহাটি মোড় থেকে দেড় কিমি পর্যন্ত এবং গ্রিডের আশেপাশের গ্রামগুলিতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। পুলিশের এই প্রচারকে কাঁচকলা দেখিয়ে পরের দিন মাছিভাঙা গ্রামের মাঠে কমিটির ডাকে বিশাল জনসভা হয়। ৩ জানুয়ারি, ২০১৭ গ্রিডের কয়েকজন কর্মচারী গ্রামে ঢুকেছিল টাওয়ার বসানোর কাজে। গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের মুখে তারা পালিয়ে যাওয়ার আগে কথা দেয় যে, তারা আর আসবে না। ইতিমধ্যে ভাঙড়ের আন্দোলনের পক্ষে গড়ে উঠেছে সংহতি কমিটি। গত ৫ জানুয়ারি কলকাতায় ডাকা হয়েছিল সাংবাদিক সম্মেলন। কমিটি এখন কলকাতায় একটি কনভেনশন করার কথা ভাবছে।

প্রতিবেদনঃ অরুণ পাল

উমা

বৃত্তি-শিক্ষা কেন্দ্র, আমাদের হাসপাতাল

ফুলবেড়িয়া, ছাতনা, বাঁকুড়া

গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী (চিকিৎসা) প্রশিক্ষণ

বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লক-এর ফুলবেড়িয়া গ্রামে বিগত ৮ বছর ধরে চলছে **'আমাদের হাসপাতাল'** — যা কেবল ওই অঞ্চল নয়, অন্য জেলা, এমন কি পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড থেকেও দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত রোগীদের এক ভরসা স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতি, স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অতিস্বল্পমূল্যে জেনেরিক ওষুধের ব্যবহারের মাধ্যমে দেশব্যাপী স্বাস্থ্যবাণিজ্যিকিকরণের বিরুদ্ধে এই হাসপাতাল এক মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রোগীর চিকিৎসার পাশাপাশি বিগত ৩ বছর ধরে চলছে আবাসিক স্বাস্থ্যকর্মী (চিকিৎসা) প্রশিক্ষণের এক কর্মসূচি। প্রথম ২ বছরে ৪০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ শেষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে সাফল্যের সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে চলেছেন। তাঁদেরও জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে সততা ও সম্মানের সঙ্গে।

ওই আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ৯ মাসের এবং অবৈতনিক। থাকা-খাওয়ার জন্য মাসে ২০০০ টাকা হিসেবে মোট ১৮০০০ টাকা দিতে হয়, যা কয়েকটি কিস্তিতেও দেওয়া যায়।

প্রশিক্ষণের শেষের দিকে ভর্তি থাকা রোগীদের চিকিৎসার প্রশিক্ষণ হয় সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতালে। বিশিষ্ট চিকিৎসক ও নার্স-শিক্ষিকারা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। প্রশিক্ষণ শেষে শংসাপত্র দেওয়া হয়। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়।

প্রশিক্ষণের মাধ্যম : বাংলা। পরবর্তী সেশন শুরু : জানুয়ারি, ২০১৭। যোগ্যতা : কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ।

বর্তমান প্রশিক্ষকমণ্ডলী :

১) ডা. পি.কে. সরকার ২) ডা. স্বপনকুমার জানা ৩) ডা. পুণ্যব্রত গুণ ৪) ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত
৫) ডা. শোভন পাণ্ডা ৬) শ্রীমতী কৃষ্ণা সরকার ৭) ড. সুব্রতা সরকার।

কি নীতি মেনে রোগীদের পরিষেবা দিতে হবে সেই বিষয়ে প্রশিক্ষিতদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দশটি শপথ নিতে হয়। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনে মোবাইল-এর মাধ্যমে তাঁরা পরামর্শ ও নির্দেশ পেয়ে থাকেন। নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাঁদের কাজের মূল্যায়ণ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসক অপ্রতুলতার সমস্যা সমাধানের এই উদ্যোগে সামিল হতে এবং উৎসুক শিক্ষার্থীদের কাছে এই খবর পৌঁছে দেবার জন্য আপনাদের অনুরোধ জানাই।

ধন্যবাদসহ

ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত

বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন :

শ্রী বিশ্বজিৎ শাসমল - ৯৪৩৪৬৪৩৮৬১

শ্রী শ্যামসুন্দর পাত্র - ৯৪৭৫৩৫৬৮৫৭

শ্রী আনন্দ কুম্ভকার - ৯৭৩৫৭৭৭৩৫৯

বৃত্তি-শিক্ষা কেন্দ্র, আমাদের হাসপাতাল, ফুলবেড়িয়া, ছাতনা, বাঁকুড়া

স্বনিযুক্তির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য (চিকিৎসা) কর্মীর অবৈতনিক প্রশিক্ষণ, নয় মাসের আবাসিক পাঠক্রম।
থাকা-খওয়া বাবদ মোট ১৮,০০০ টাকা। বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সেবিকারা প্রশিক্ষণ দেন।
যোগাযোগ : বিশ্বজিৎ শাসমল: ৯৪৩৪৬৪৩৮৬১

পুস্তক পর্যালোচনা

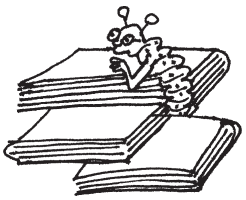

জাদুসম্রাট গণপতি ও বাঙালির জাদুচর্চা। সমীরকুমার ঘোষ। সপ্তর্ষি প্রকাশন। ৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০৯। দাম : ২৫০ টাকা (বোর্ড বাঁধাই)। ২০০ টাকা (পেপার ব্যাক)

দীর্ঘলালিত মিথ্যাচারের যোগ্য জবাব

বাঙালি জাদুকরের কথা উঠলেই আমরা জাদুসম্রাট পি সি সরকার মানে প্রতুলচন্দ্রের কথা বলি। তারপর তাঁর পুত্র প্রদীপ ও প্রদীপের কন্যা মানেকা। প্রদীপরা দাবি করেন তাঁরা বংশ পরম্পরায় জাদুকর। প্রতুলচন্দ্রের কোনো গুরুর নাম সরকার পরিবারের কেউ মুখে আনেন না। আর পাঁচজন বাঙালির মতো আমার জ্ঞানের চৌহদ্দিও ছিল তাই। জাদুসম্রাট পি সি সরকার ছাড়া উল্লেখযোগ্য বাঙালি জাদুকরের নামই জানতাম না। প্রদীপচন্দ্রের কথাই বিশ্বাস করতাম, ওঁরা বংশ পরম্পরায় জাদুকর। এই বিশ্বাসের ওপর প্রথম আঘাত হানে এই উৎস মানুষ পত্রিকাতেই প্রকাশিত সমীরকুমার ঘোষের ধারাবাহিক লেখাটি। সেই লেখা পড়েই জানতে পারি প্রতুলচন্দ্রের গুরু জাদুসম্রাট গণপতি চক্রবর্তীর নাম। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, সেই সঙ্গে উপেক্ষার কথাও। শুধু গণপতি নন, জানতে পারি বিদেশে প্রথম পেশাদার বাঙালি জাদুকর রাজা বোস ও রয় দ্য মিস্টিকের মতো প্রতিভাধর জাদুকরের নামও। আশ্চর্য হই জেনে, ১৮৭৫ সালেই দর্জিপাড়ায় গড়ে উঠেছিল উইজার্ড ক্লাবের মতো জাদু সংগঠন। এরই মধ্যে গত বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে সমীরকুমারের 'জাদুসম্রাট গণপতি ও বাঙালির জাদুচর্চা'। পত্রিকার লেখা থেকে বই আরও ব্যাপকতর। যুক্ত হয়েছে বহু তথ্য, দুষ্প্রাপ্য ছবি। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। আসি সেই বইয়ের কথায়।

এক জায়গায় জাদুর খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। গণপতির সঙ্গে দেখা করলেন এক দরিদ্র, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ। গণপতির কাছে তাঁর আর্জি, হাওয়া থেকে টাকা ধরার বিদ্যেটা শিখিয়ে দিতে হবে তাঁকে। কারণ, নিদারুণ অর্থসঙ্কট তাঁর আর সহ্য হয় না। অর্থাভাবে অর্থাৎ পাড়ানির অভাবে মেয়েটার ভাল সম্বন্ধ হাতছাড়া হয়ে যেতে বসেছে। এসব শুনে চোখে জল এসে যায় গণপতির। গরিব ব্রাহ্মণকে তিনি বলেন, 'ভাই, সত্যি সত্যি হাওয়া থেকে টাকা ধরার বিদ্যে জানলে কি আর এত লোকজন, লটবহর নিয়ে ঘুরে ঘুরে জাদুর খেলা দেখিয়ে টাকা রোজগার করতে হত আমাকে?'

কন্যাদায়গ্রস্ত গরিব ব্রাহ্মণ হৃদয়ঙ্গম করেন টাকা ধরাটা এক ধরনের খেলা। হতাশ হন তিনি। যদিও শেষ পর্যন্ত সেই ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে ভাল বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন গণপতি। ইনি হলেন সেই গণপতি চক্রবর্তী, যিনি সিনিয়র পি সি সরকারের জাদুশিক্ষার গুরু। যাঁকে সরকার পরিবার বাদ দিয়ে তাবৎ জাদুকরই আধুনিক ভারতীয় জাদুবিদ্যার জনক হিসাবে স্বীকার করেন।

'জাদুসম্রাট গণপতি ও বাঙালির জাদুচর্চা' এক অসাধারণ তথ্যসমৃদ্ধ বই। আমি তো বইটিকে গবেষণাগ্রন্থই বলব। উল্লেখ্য, গণপতি প্রয়াত হন ১৯৩৯ সালে। তাঁকে নিয়ে সাহিত্যিক ও জাদুরসিক অজিতকৃষ্ণ বসু ছাড়া কেউই তেমন কিছু লেখেন নি। কিন্তু সমীরকুমার ঘোষ গভীর অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়ে একদিকে যেমন সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা ও কথা থেকে গণপতির জাদু-বীরত্বকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, তেমনই গণপতির শিষ্য বেশ কিছু জাদুকরের মুখ দিয়ে তাঁর কথা উপস্থাপিত করেছেন। গণপতি সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করতে তাঁর শিষ্য জাদু প্রভাকর দুলালচন্দ্র দত্তের বয়স যখন ৯৭, সেই সময় হরিপালে গিয়ে স্মৃতিচারণা শুনে এসেছেন লেখক। গিয়ে দেখেন, '৯৭ বছর বয়সেও জাদুপ্রভাকরের শরীর দিব্যি সতেজ, গমগম করছে কণ্ঠ। আর স্মৃতিতে এতটুকু মরচে পড়েনি। গুরু গণপতির কথা বলতেই এক লাফে বয়স যেন তিন কুড়ি কমে গেল! বিছানায় উঠে বসলেন।'

বইটি পড়তে পড়তে একদিকে গণপতির জীবন যেমন ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়, তেমনই কৃষক পরিবারের ছেলে সিনিয়র পি সি সরকার, মানে প্রতুলচন্দ্র সরকারের জাদুসম্রাট হয়ে ওঠার

কাহিনীকে কেন সেভাবে এতাবৎকাল সরকার পরিবার স্বীকার করেনি, তা নিয়ে সত্যিই ধন্দ লাগে। যদিও সমীরকুমার তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে শেষে 'ফুস মন্তর জবাবদিহি' নামে প্রকাশিত ৮ পৃষ্ঠার একটি দ্বিমাসিক সংবাদ বুলেটিন থেকে উদ্ধার করেছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য। ৩১ জুলাই ২০০৩-এ প্রকাশিত সংখ্যায় একটি ছবি ছাপা হয়েছিল। তাতে দেখা যাচ্ছে গণপতিবাবুর একটি ছবির পাশে দাঁড়িয়ে প্রদীপচন্দ্র সরকার এবং আরেক ভদ্রলোক। ছবির নিচে লেখা – আমার বাবার শিক্ষাগুরু গণপতি চক্রবর্তীর স্মৃতিস্মারক কোথাও কিচ্ছু নেই। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের পাথরও বিক্রি হয়ে গেছে সম্প্রতি। সম্প্রতি আমি গণপতিবাবুর বুকের কয়েকটা মেডেল স্থানীয় বাসিন্দা শ্রী কানন মাইতির সাহায্যে উদ্ধার করেছি।' এরপরই সমীরকুমার ঘোষের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। যেখানে তিনি লিখেছেন, 'ছবিটি দেখে বাবার শিক্ষাগুরুর প্রতি ছেলের ভক্তিতে পাঠক আপ্লুত হতে পারেন। মনে হতে পারে, গণপতিবাবুর স্মৃতি রক্ষার্থে উনি বুঝি খুবই উদগ্রীব। তা সত্যি কি না পরখ করা যাক। এরই কয়েক বছর পরে সিনিয়র পি সি সরকারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রদীপচন্দ্ররা গোর্কি সদনে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। পাঠক নিশ্চয়ই ভাবছেন, সেখানে বাবা প্রতুলচন্দ্র সরকারের শিক্ষাগুরু গণপতির বিরাট একটি ছবি রাখা হয়েছিল! গণপতিবাবুর বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া মেডেলগুলোও নিশ্চয়ই সেখানে ছিল! এমনটা ভাবলে আবার হোঁচট খেতে হবে। প্রদর্শনীতে অনেক ছবির মধ্যে গণপতির একটি ছোট ছবি ছিল বটে, তবে সে ছবির তলায় গণপতির নাম লেখা বা পরিচয় দেওয়ার কোনও সৌজন্য দেখানো হয়নি!'

সংবাদপত্রে প্রায়ই পি সি সরকার জুনিয়রের লেখা পড়ি, তাঁর বাবাকে নিয়ে। কোথাও বাবার গুরু হিসাবে গণপতির কথা উনি উল্লেখ করেন না। কোথাও কোথাও তো রীতিমতো ছোট করেন। ভারতীয় ঐতিহ্যে গুরুকে অস্বীকার করা মহা পাপ বলে গণ্য। ইতিহাসকে অস্বীকার করে কেন সরকার পরিবারের গুরুকে অস্বীকার করার চেষ্টা, তা সত্যিই রহস্যের। শিল্পী দেবব্রত ঘোষ বইটির অনবদ্য প্রচ্ছদ করেছেন। ছাপাও খুব ভাল। অনেক খেটেখুটে যেভাবে লেখক ইতিহাসের বিস্মৃত নায়ককে প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছেন, তার জন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

উমা

সংগঠন সংবাদ

চেতনার বিজ্ঞানমেলা

উৎস মানুষের প্রতিবেদনঃ হাতিবাগানে চেতনার ২৬তম 'বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক মেলা' চারদিন ধরে (২৯ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি ২০১৭) হয়ে গেল। গত বছর মেল হয় নি। উত্তর কলকাতার এই মেলার খুব নামডাক। কালো টাকা নিয়ে এত শোরগোলের মধ্যে এরকম একটা মেলা করা চাট্টিখানি কথা নয়। ক্ষুদিরাম বসু রোড ও নটী বিনোদিনী সরণি (এই নামকরণে চেতনার অবদান ভোলা যাবে না) জুড়ে এই মেলা। ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো আলো ঝলমলে রাস্তার দুধারে ছোট ছোট স্টল। সেখানে চলছে হরেক রকমের প্রদর্শনী। ঘড়ি চলে টিকটিক-সময়টা ঠিকঠিক, বাজনার বিজ্ঞান, জলও কেনা, কাগুজে জ্যামিতি, বইয়ের স্টল, আবার অবহেলিত জাদুসম্রাট গণপতি চক্রবর্তীর জীবন নিয়ে অজানা কথা, আজকের প্রমিথিউসরা- যাতে রয়েছেন সেই গ্যালেলিওর সময় থেকে শুরু করে নরেন্দ্র দাভোলকর, শঙ্কর গুহনিয়োগীর মতো অকুতোভয় মানুষরা। এছাড়া সাংস্কৃতিক মঞ্চে নানান অনুষ্ঠান; তথ্যচিত্র, লোকসংগীত, ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী ও পথনাটক। লোকে লোকারণ্য বললে একটু বাড়াবাড়ি হবে না। সব স্টলেই সদস্যদের দেখা গেল দর্শকদের বিশদে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বেশ একটা উৎসব উৎসব পরিবেশ। অল্পবয়সীদের ভিড়। চেতনার এই মেলা ইতিহাসে ঠাঁই পাবার মতো ঘটনা। তবে সবটাই খুব ভাল হয়েছে বলে পিঠ চাপড়াতে পারা গেল না। আজকের প্রমিথিউসরা বলে যে থিম, তাতে যথেষ্ট মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল। তেমনি জাদুকর গণপতির জাদুপ্রদর্শনী কেবল এদেশে নয়, দেশের বাইরেও বিপুল প্রশংসা কুড়িয়েছিল সে সবের উল্লেখ থাকলে ভাল হত। চেতনার 'বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক মেলা' খুব প্রাণবন্ত। দাবি জানাই, এই মেলা বহু বহুদিন চলুক।